দাম : ষোলো টাকা

# স্বস্তিকা

৭৭ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা।। ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫।। ১১ ফাল্গুন, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

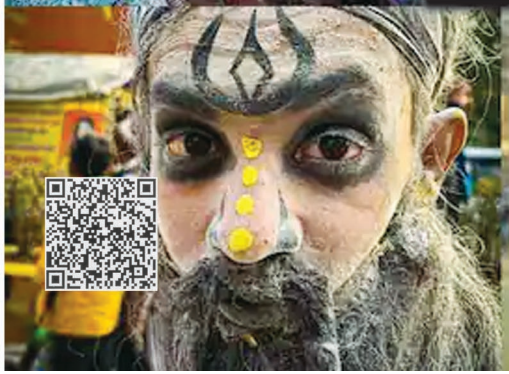

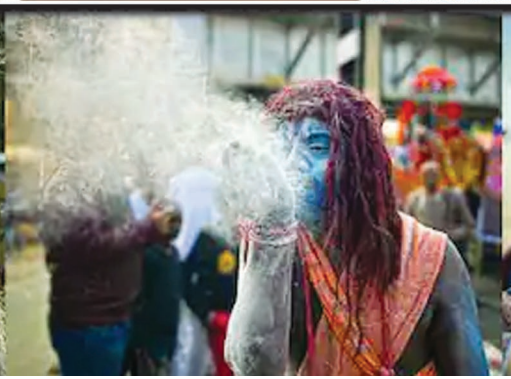

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

# স্বস্তিকা

*।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।*

৭৭ বর্ষ ২৫ সংখ্যা, ১১ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

২৪ ফেব্রুয়ারি - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com


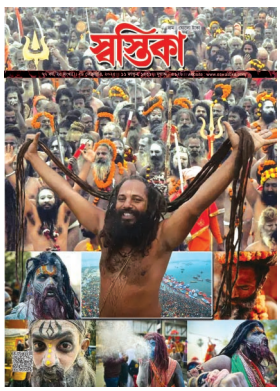


**সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা**

**সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল**

**প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত**

দূরভাষ :

**সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)**

**সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫**

**সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪**

**বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩**

**দাম : ১৬ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।**

**Postal Registration No.-** KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।


# সূচীপত্র


সম্পাদকীয় □ ৫

**অবিশ্বাসের বাতাবরণ রাজ্যের দুর্নীতি আর ধ্বংসকে সম্পৃক্ত করেছে**

**কাদার বাঁশ** □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

**ধারে ধারে রাজ্য বেহাল, দিদির জেদ তবু বহাল**

□ সুন্দর মৌলিক □ ৭

**শাসকদলের মদতে পশ্চিমবঙ্গ এখন জেহাদিদের স্বর্গরাজ্য**

□ ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৮

**বাংলাদেশের হিন্দুরা স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের প্রদর্শিত পথেই চলেছেন** □ অসিত চক্রবর্তী □ ১১

**ভারতবর্ষ একটি ব্যতিক্রমী দেশ** □ অমলেশ মিশ্র □ ১৪

**বিস্মৃত প্রথম ভাষাসৈনিক ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও একুশে ফেব্রুয়ারি**

□ ড. বিনয়ভূষণ দাশ □ ১৫

**মহাকুম্ভ ধর্মীয় ঐতিহ্য ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনার অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ**

□ ধর্মানন্দ দেব □ ১৭

**মহাকুম্ভমেলায় আমার চোখে এক টুকরো ভারত**

□ কুমারেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার □ ১৯

**আমার দেখা মহাকুম্ভমেলা** □ নিত্যানন্দ দত্ত □ ২০

**কপিল মুনির সাগরে শ্রীরামের ভারত** □ হীরক কর □ ২৩

**তীর্থক্ষেত্র ত্রিবেণী বাঙ্গালি হিন্দুত্বের অতীত ও বর্তমান**

□ পল্লব মণ্ডল □ ৩১

**বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ঠাকুর ওঙ্কারনাথ দেব**

□ অধ্যাপক গোপাল চক্রবর্তী □ ৩৩

**মহাসমারোহে সম্পন্ন হলো ত্রিবেণী কুম্ভ**

□ বিজয় আঢ্য □ ৩৪

**প্রয়াগে সরস্বতীর অবস্থান বিজ্ঞানসম্মতভাবে স্বীকৃত**

□ গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৩৫

**জাতীয় পুনর্জাগরণে কুম্ভমেলার গুরুত্ব** □ উত্তম বেজ □ ৩৬

**কুম্ভমেলার অনুভব** □ প্রদীপ মজুমদার □ ৩৭

**মহাকুম্ভ : হিন্দুশক্তি ও সংস্কৃতির অবিরল ধারা**

□ দুর্গাপদ ঘোষ □ ৪৩

**তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের দেশ হয়েও বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি হওয়ার পথে ভারত** □ বিশ্বামিত্র □ ৪৯

**গল্পকথায় ডাক্তারজী** □ বিমলকৃষ্ণ দাস □ ৫০

**নিয়মিত বিভাগ :**

**□ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ৩৭-৩০ □ খেলা : ৩৮ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১**

প্রকাশিত হবে
৩ মার্চ
২০২৫

# স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৩ মার্চ
২০২৫

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

## দিল্লির পট পরিবর্তন

১৯৯৮ সালের পরবর্তী পর্যায়ে প্রায় ২৬ বছর দিল্লিতে ক্ষমতাসীন ছিল কংগ্রেস ও আম আদমি পার্টি। তাদের অপশাসন ও দুর্নীতির কবলে পড়ে দিল্লিবাসীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছিল। শুধু অনুদান আর পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতির আড়ালে আপ-এর কুশাসনে দিল্লির ভোটাররা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। এর থেকে বাঁচতে তাঁরা পরিবর্তনের পথকেই বেছে নিয়েছেন। রাষ্ট্রবাদী একটি দলকে দিল্লির ক্ষমতায় আসীন করে তাঁরা বার্তা দিলেন রাষ্ট্রীয় একতাই সর্বোপরি।

সম্প্রতি দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করবেন কয়েকজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক। সঙ্গে থাকবে সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিতে বিজেপির নতুন রাজনৈতিক রণকৌশলের কার্যকারিতা।

## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
**SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
**INDIAN OVERSEAS BANK**
Branch : **Sreemani Market**
**Kolkata-700 006**

*With Best Compliments*
*From-*

**A**
**Well Wisher**

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

# সম্পাদকীয়

## পূর্ণমহাকুম্ভ : মহামিলনমেলা

সমগ্র বিশ্বের আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্রভূমি হইল ভারতবর্ষ। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সহস্রার। দেবভূমি ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও জীবনচর্যার মেরুদণ্ডস্বরূপ হইল ধর্ম। শতাব্দীর পর শতাব্দী, সহস্রাব্দের পর সহস্রাব্দে এই ধর্ম সংঘটিত করিয়াছে সামাজিক মেলবন্ধন, জন্ম দিয়াছে রাষ্ট্রচেতনার। ভারতীয় ভূমিতে মুনি-ঋষিগণ কর্তৃক রচিত অথর্ব বেদ-সহ বিভিন্ন পুরাণকথায় কুম্ভমেলার বর্ণনা গ্রন্থিত হইয়াছে। পৌরাণিক আখ্যান অনুযায়ী, দেবাসুরের সমুদ্রমন্থনে ক্ষীরসমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়াছিল পবিত্র অমৃত। সেই অমৃতে পূর্ণ কলস বা কুম্ভ যাহাতে অসুরদিগের হস্তগত না হয়, সেই লক্ষ্যে অবিচল দেবগণ ভারতবর্ষের চারিটি স্থানে—হরিদ্বার, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী ও নাসিকে এই কলসকে লুক্কায়িত রাখেন। স্মরণাতীতকাল তাই হইতে এই স্থানসমূহে অনুষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে কুম্ভমেলা। জগদ্গুরু শ্রীশ্রী আদি শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী, ৬ বৎসর অন্তর অর্ধকুম্ভ, ১২ বৎসর অন্তর পূর্ণকুম্ভ এবং ১২টি পূর্ণকুম্ভের পর, অর্থাৎ ১৪৪ বৎসর অন্তর পূর্ণমহাকুম্ভ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই শতাব্দীর পূর্ণমহাকুম্ভ এই বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়াছে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে। কথিত যে, প্রাচীনকালে সম্রাট হর্ষবর্ধন এই প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমেই মাঘ মাসে অনুষ্ঠিত কুম্ভমেলায় নিজের সর্বস্বদান করিতেন। এই বৎসর মকর সংক্রান্তির দিন হইতে মহাশিবরাত্রি অবধি স্থায়ী হইয়াছে মহাকুম্ভমেলা। প্রায় ৫০ কোটি পুণ্যার্থী এই মহাকুম্ভে যোগদান করিয়া, পুণ্যসলিলা-পতিতপাবনী ত্রিবেণী ধারায় অবগাহনপূর্বক শামিল হইয়াছেন এক আধ্যাত্মিক অনুভবের জয়যাত্রায়। অমৃতকুম্ভ সন্ধানী অগণিত পরিব্রাজক অমৃতস্নানের মাধ্যমে অর্জন করিয়াছেন এক অপার, অপার্থিব অনুভূতি।

জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, সূর্য ও চন্দ্র মকর রাশিতে এবং দেবগুরু বৃহস্পতি বৃষ রাশিতে অবস্থান করিলে সেই সময়কালে পূর্ণমহাকুম্ভ সংঘটিত হইয়া থাকে। বিশ্বের সমগ্র মানবসমাজ প্রকৃতপক্ষে সনাতনী। বহু মানবশিশু হিন্দু হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও, তাহাদিগকে পরবর্তী জীবনে নানা প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট মজহব কিংবা রিলিজিয়নে ধর্মান্তরিত করিবার প্রক্রিয়া চলিতেছে। কিন্তু সনাতনী শিকড় চিরন্তন এবং সেই বৃক্ষজাত বীজ চিরকালীন। তাহা মানবাত্মার অনেক গভীরে প্রোথিত। তাই হিন্দুসমাজ ব্যতীত বিশ্বের অন্যান্য দেশেও শতাব্দীর এই অনন্য সমাবেশকে লইয়া ব্যাপকতর সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। নিশ্চিতভাবে প্রতীত হইতেছে যে একবিংশ শতাব্দী হইল ভারতের শতাব্দী। মহাকুম্ভে অংশগ্রহণ করিয়া এই বিরল মুহূর্তের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য অসংখ্য বিদেশি নাগরিকের সমাগম ঘটিয়াছে প্রয়াগরাজে। এই তীর্থযাত্রীদের মধ্যে অন্যতম হইলেন প্রয়াত অ্যাপল্ কর্তা স্টিভ জোবসের সহধর্মিণী লরিন পাওয়েল। ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বরেণ্য শিল্পপতি মুকেশ আম্বানি-সহ অসংখ্য বিশিষ্টজন মহাকুম্ভমেলায় ইতিমধ্যেই অংশগ্রহণ করিয়াছেন।

গঙ্গা-যমুনা ও সরস্বতীর ত্রিবেণী সঙ্গমে প্রয়াগরাজ হইল যুক্তবেণী। এই পবিত্র স্থানে তিনটি নদী সংযুক্ত হইয়াছে। বঙ্গভূমিতে হুগলী জেলায় ত্রিবেণীতেও এই তিনটি নদীর সঙ্গম বিদ্যমান। কিন্তু এই সঙ্গমস্থলে তাহা মুক্তবেণী। অর্থাৎ, নদীসমূহ সঙ্গমের অব্যবহিত পরেই বিযুক্ত-বিভক্ত হইয়াছে এবং বঙ্গোপসাগর অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে হুগলী জেলার ত্রিবেণীতেও সুপ্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত আয়োজিত হইয়া চলিয়াছে কুম্ভমেলা। তুর্কি, আফগান ও মুঘলদিগের ভয়াবহ, নারকীয়, বিভীষিকাময় শাসনামলে স্তব্ধ হইয়া যায় এই মেলার অনুষ্ঠান। বাঙ্গালি ভুলিতে থাকে তাহার সনাতনী সংস্কৃতি। আশার কথা, সাম্প্রতিক অতীতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কতিপয় ভক্ত ও ধার্মিক ব্যক্তির সর্বপ্রকার সহযোগিতায় প্রতি বৎসর পুনরায় এই স্থানে আয়োজিত হইয়া চলিয়াছে কুম্ভমেলা। অনুরূপভাবে, বহু শতাব্দী ধরিয়া বৃন্দাবনে দিব্যকুম্ভ, তামিলনাড়ুর কুম্ভকোনমে মহামহম (দক্ষিণী কুম্ভ)-এর প্রচলন রহিয়াছে। ভারত ব্যাপী সংঘটিত এই সকল মেলা জাতির মহামিলন ঘটাইয়াছে, সমাজের আধ্যাত্মিক উত্তরণের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। অমৃতস্নানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আখড়ার নাগা সন্ন্যাসী এবং দশনামী পরম্পরার সাধুসন্তদের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বা পেশোয়াই এবং ধর্মসংসদ হইল কুম্ভমেলার সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। মৌনী অমাবস্যা তিথিতে অমৃতস্নানের উদ্দেশ্যে এই মহাকুম্ভে আগত কোটি কোটি পুণ্যার্থীর ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হইয়া গত ২৯ জানুয়ারি প্রায় ৩০ জন তীর্থযাত্রীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটিয়াছে। মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক এই ঘটনার পশ্চাতে রহিয়াছে অন্তর্ঘাত এবং গভীর ষড়যন্ত্র। কুম্ভের সমালোচনায় মুখর হইয়াছে রাষ্ট্রবিরোধী ইন্ডিজোট। এই জোটের প্রধান দল কংগ্রেসের শাসনামলে ১৯৫৪ সালে প্রয়াগে অনুষ্ঠিত কুম্ভমেলায় পদপিষ্ট হইয়া কয়েকশো পুণ্যার্থীর অকালমৃত্যু ঘটিয়াছিল। সেই ঘটনা ভুলাইয়া দিবার চক্রান্তে শামিল হইয়াছে বিদেশি অর্থে পুষ্ট এক শ্রেণীর সংবাদমাধ্যম। আধ্যাত্মিকতার শক্তিতে ভরপূর্বক ভারতের পুনরুত্থানের সাক্ষী রহিল ২০২৫-এর পূর্ণমহাকুম্ভ। দেশি-বিদেশি সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া আপামর হিন্দুসমাজ পূর্ণমহাকুম্ভকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। সংঘটিত হইয়াছে সনাতনী পরম্পরা ও ধর্মের জয়, গর্জিত হইয়াছে আধ্যাত্মিকতা ও বিশ্বমানবতার বিজয়োদ্ঘোষ, বিশ্বমাঝে সর্বত্র যেন অনুরণিত হইয়াছে স্বামীজীর বাণী— 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'।

## সুভাষিতম্

**বলবানপ্যশক্তোঽসৌ ধনবানপি নির্ধনঃ।**

**শ্রুতবানপি মূর্খোঽসৌ যো ধর্মবিমুখো জনঃ।। (হিতোপদেশ)**

যে ব্যক্তি নিজের কর্তব্যকর্ম থেকে বিমুখ থাকে, সে বলবান হয়েও দুর্বল, ধনবান হয়েও নির্ধন এবং জ্ঞানী হয়েও মুর্খের তুল্য।

## অবিশ্বাসের বাতাবরণ রাজ্যের দুর্নীতি আর ধ্বংসকে সম্পৃক্ত করেছে

# কাদার বাঁশ

**নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়**

হিন্দুত্ব যে ছোঁয়াচে আর সাম্প্রদায়িক— অনেক চেষ্টা করেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের ৪০ শতাংশ ভোটারকে তা বোঝাতে পারেননি। তেমনই পারেননি এটা বোঝাতে যে মুসলিম মোল্লাবাদ বলে কিছু হয় না। ফলে রাজ্য জঙ্গিতে ভরে গিয়েছে বলে দাবি উঠছে। বাড়তি সুবিধার আশায় মুসলমানরা মমতাকে সমর্থন করে। ভোটানুপাতে মমতা সংখ্যালঘুর মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের বেশিরভাগ (৫৫ শতাংশ) ভোটার মমতা বিরোধী। তবু 'কাদার বাঁশেদের' দয়ায় মমতা ক্ষমতায়। এই বিধর্মী নিরপেক্ষদের যেদিকে ঠেলবেন সেদিকে হেলবে। সংখ্যায় অল্প, কিন্তু প্রভাবে উচ্চ।

২০১৯ সালে আনুমানিক ২০ শতাংশ অতিরিক্ত ভোট বিজেপির ঝুলিতে আসে। তাতে বিজেপির ১৮টি সাংসদ প্রাপ্তি ঘটলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তাতে মমতা বিরোধী লড়াইয়ে বিজেপি অনেকটা এগিয়ে যায়। তারা কম-বেশি করে এখন সেই পরিমাণ ভোট ধরে রেখেছে। তবে মমতা নিধন হয়নি। ভগ্নস্তূপ বাম এখন মমতার বন্ধু। তাদের শেষতম দলিল তাই বলছে। মমতা জোরের সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন পরের বছর রাজ্য ভোটে তিনি একা লড়বেন। বিজেপির বিরুদ্ধে একা লড়ার পরিণাম আপ দল আর কংগ্রেস দিল্লি ও হরিয়ানা নির্বাচনে হাড়ে-মজ্জায় টের পেয়েছে।

মমতা কেন একা লড়ছেন? মমতার ঘরে আর বাইরে শত্রু। পঞ্চায়েত আর লোকসভা ভোট সরকার বদলানোর ভোট ছিল না। আসন্ন রাজ্যভোট বিজেপিকে মমতাকে পালটানোর সুযোগ করে দেবে। সে চেষ্টা ব্যর্থ না হলেও এই মুহূর্তে মমতা যে ব্যাকফুটে তা বলা কঠিন। ২০১৯-এর জাতীয় ভোটের পর থেকে বিজেপি তাদের সংগঠন মজবুত করতে উঠেপড়ে লেগেছে। ওই সময় থেকে তারা শক্তিশালী ভোট অঙ্ক বজায় রেখেছে। রাজ্যে কাদার বাঁশ রাজনীতি প্রমাণ করে মমতা পরমুখাপেক্ষী। বাম আর বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসের ভোটের জন্য লালায়িত। মমতা বহুস্বরা। প্রকাশ্যে বাম আর কংগ্রেস বিরোধী। মমতা ভালো জানেন যে, বিজেপিকে আটকানো কংগ্রেস বা বামেদের থেকে ভোট পাওয়ার তুলনায় অনেক কঠিন। কারণ বিজেপি ভোটের সঙ্গে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধের লড়াই চালায়।

স্বাধীনতার পর থেকে রাজ্যের বুকের উপর দিয়ে পাশ্চাত্য প্রভাবিত কংগ্রেসি জাতীয়তাবাদ আর বিদেশি বামপন্থীদের অপসংস্কৃতির ঝড় বয়ে গিয়েছে। কিছুটা হলেও মমতা তার আঁচ সংগ্রহ করেছেন। কাদার বাঁশ সেজে এপার-ওপারের রাজনৈতিক ঠেলাঠেলি খেলেছেন। আপাতত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তর্ধান ঘটেছে। কেউ জানে না কীভাবে ঝুলে রয়েছেন। বর্তমান অস্তিত্ব মমতা শিবিরের ভিতরে না বাইরে। কংগ্রেসের পারিবারিক বাতাবরণের আঁতুড়ঘরে বেড়ে ওঠা মমতা যে অভিষেককে সময়মতো ফিরিয়ে আনবেন তা নিশ্চিত। যেমন রাহুল আর প্রিয়াঙ্কা।

> চাঁদের কলঙ্ক বা সোনায় খাদ আর তৃণমূলের দুর্নীতি এক নয়। ওতে পবিত্রতা আছে, আর এটা কেবল পাপ।

মমতা চোখে শোনা আর কানে দেখার রাজনীতি করেন। তাতে রাজ্যে অসহায় আর অবিশ্বাসী রাজনৈতিক বাতাবরণ তৈরি হয়। আর সেই ছুতোয় মমতা নিজেকে তুলে ধরেন। রাজ্য রাজনীতিতে এই মুহূর্তে সব চাইতে অসহায় অভিষেক। এই কাদার বাঁশটিকে মমতা কোন দিকে ঠেলবেন তা বলা কঠিন। তৃণমূল দলের মধ্যে অভিষেক এতটাই উচ্চাভিলাষী হয়ে উঠেছিলেন যে মমতা তাকে বেশি করে পাঁকে পুঁতে দিতে বাধ্য হন। মমতার ভাষায় এই জটিলতার মাঝখানে ঢুকে রয়েছে 'প্যাক ফ্যাক' বা আই-প্যাক পরামর্শদাতা সংস্থা। এই সংস্থাই হয়তো অভিষেককে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছে মমতাকে সামনে রেখে।

সব রাজনৈতিক দলেই দুর্নীতি আর দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব কম-বেশি থাকে। দুর্নীতি থাকবে, আর অন্তর্দলীয় কোঁদল থাকবে না তা হয় না। এটাই স্বাভাবিক যে বেআইনি পথে আসা অর্থের বিরুদ্ধে অভিযোগ আর আঙুল তোলার অধিকার দলের প্রত্যেকের রয়েছে। তৃণমূলে হচ্ছেও তাই। চাঁদের কলঙ্ক বা সোনায় খাদ আর তৃণমূলের দুর্নীতি এক নয়। ওতে পবিত্রতা আছে, আর এটা কেবল পাপ। এটা যদি মেনে নিই যে তৃণমূলের সফরসঙ্গী দুর্নীতি আর রাজনৈতিক কাদার বাঁশ, তাতে বিরোধী বিজেপির কাজ কঠিন বই সহজ হয় না। এই রাজনৈতিক কাদার বাঁশ ঠেলার বদলে উপড়ে ফেলতে এবং রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে নিয়ে আসতে বিজেপিকে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।

*(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)*

# ধারে ধারে রাজ্য বেহাল দিদির জেদ তবু বহাল

ঋণপ্রিয়েষু দিদি,

আমি আপনার একান্ত অনুগত ভাই হিসাবে সব কিছুকেই সমর্থন করি। কিন্তু দিদি, এবার মনে হচ্ছে, কিছু কথা বলা দরকার। সদ্যই আপনার সরকার যে বাজেট বিধানসভায় পেশ করেছে তা নিয়ে আমি দিদি খুবই চিন্তিত। খরচ বাড়ানোর অনেক ঘোষণা করেছেন আপনি, কিন্তু কোথা থেকে টাকা আসবে তার কিছু ঠিক ঠিকানা নেই। সেই সঙ্গে কেন্দ্রের সঙ্গে অক্ষমের লড়াই লড়তে গিয়ে জেদ দেখাচ্ছেন। জেদের বশে এমন কিছু খরচ করছেন যা আপনার করার কথা নয়। করার ক্ষমতাও নেই।

আগামী বছরেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে এটাই ছিল শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট। সেটা 'ঘুষমুখী' যে হবেই, সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ ছিল না আমার। এই বাজেটের ভরকেন্দ্র গ্রাম। কারণ, গত লোকসভা নির্বাচনের ফল বলছে, আপনার দলের ভিত নড়ে গিয়েছে শহরাঞ্চলে। তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে শহরাঞ্চলের ভোটারদের একটা বড়ো অংশ মুখ ফিরিয়ে নিলেও গ্রামীণ ভোটব্যাংক মোটের উপরে অক্ষতই। অর্থনীতির যুক্তি অনুসারে এই খরচে আপত্তি করার কারণ নেই—গৃহনির্মাণের খাতে খরচ করলেও সে টাকায় কর্মসংস্থান হবে, টাকা ঘুরে বাজারে আসবে; লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের খরচও শেষ অবধি বাজারের চাহিদাই বাড়াবে। গৃহ বা সড়ক নির্মাণের মতো প্রকল্পে স্থায়ী সম্পদও সৃষ্টি হবে। প্রশ্ন অন্য জায়গায়। প্রথম কথা, এই বিপুল অর্থের সংস্থান হবে কোথা থেকে? সহজ উত্তর— ঋণের মাধ্যমে।

গত বাজেটে রাজস্ব আদায়ের যে অনুমান পেশ করা হয়েছিল, বছর শেষের সংশোধিত হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে, আদায়ের পরিমাণ তার তুলনায় কম। বর্তমান বাজেট রাজস্ব আদায়ের অনুমান গত বাজেটের অনুমানের চেয়েও অনেকখানি বেশি— ফলে, সে আশা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা কতখানি আপনি ভালোই জানেন। সম্ভব হবে না। এই অবস্থায় সরকার ভোটমুখী বিপুল ব্যয়ের পথে হাঁটলে তার ফল তো বিপজ্জনক হবেই দিদি। সেই বিপদের স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অনুপাতে ঋণের পরিমাণে। ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে এই অনুপাত ছিল ৩৬.৮৮ শতাংশ; বাজেটে অনুমান, আগামী অর্থবর্ষে তা বেড়ে দাঁড়াবে ৩৭.৯৮ শতাংশে। ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলির জিএসডিপি-ঋণের অনুপাতের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা এমনিতেই সঙ্গিন— তার উপরে সেই অনুপাত এক বছরের মধ্যে আরও ১.১ শতাংশ-বিন্দু বাড়লে তা দুঃসংবাদ। সম্প্রতি প্রকাশিত পরিসংখ্যান বলছে, ভারতের যে পাঁচটি রাজ্যের আর্থিক স্বাস্থ্য সর্বাপেক্ষা উদ্বেগজনক, পশ্চিমবঙ্গের নাম রয়েছে সেই তালিকায়। এই অবস্থায় রাজ্যের কোষাগার এই বিপুল ব্যয়ের বোঝা টানতে পারবে কি না, প্রশ্ন উঠবেই। তার চেয়েও উদ্বেগজনক কথা হলো, যে সব খাতে বরাদ্দ বেড়েছে নামমাত্র, শিক্ষা তার মধ্যে একটি। পশ্চিমবঙ্গের বহু স্কুল-কলেজ পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে; নতুন তৈরি হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বেশিরভাগই আক্ষরিক অর্থে নামমাত্র— সেখানে শিক্ষকও নেই, পরিকাঠামোও নেই। মহিলা ও শিশুকল্যাণ খাতেও বৃদ্ধির কার্যত পুরোটাই গিয়েছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে— যা দিয়ে ভোট পাওয়া যায়। যেখানে সরাসরি ভোট নেই, সেখানে বরাদ্দ বৃদ্ধিও নেই, এমনকী বহুলপ্রচারিত মহিলা উন্নয়নের প্রশ্নেও।

**এত ঋণ শোধ করবেন কী করে? প্রতি বছরেই তো প্রায় ৮০ হাজার কোটি টাকা চলে যায় ঋণ শুধতে। এর পরে কী হবে দিদি। গর্ত বোজাতে গিয়ে আরও আরও গর্ত খোঁড়া কি ঠিক হচ্ছে দিদি?**

এর উপরে আবার আপনার রাজনৈতিক জেদ। কেন্দ্রীয় সরকার একশো দিনের কাজ প্রকল্পে টাকা দেওয়া বন্ধ করেছে বলে রাজ্যই সেই টাকা দেবে বলেছেন। কর্মশ্রী প্রকল্পে ৫০ দিনের কর্মসংস্থান করতে তো টাকা লাগবে। তার চেয়ে কেন্দ্রকে হিসাব দিয়ে দেওয়াটাই তো বুদ্ধিমানের কাজ। কেন্দ্রীয় আবাস যোজনার পালটা পশ্চিমবঙ্গের বাড়ি প্রকল্প নিয়েও একই কথা। বাজেটে কেন্দ্রীয় গ্রাম সড়ক যোজনার সঙ্গে টক্কর দিতে সড়ক নির্মাণেও রাজ্য সরকার হাত খুলে বরাদ্দ করেছে। ফলে আপনি ঠিক করেছেন আরও আরও ঋণ নেবেন। ইতিমধ্যেই যা সাত লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে।

কিন্তু দিদি, এত ঋণ শোধ করবেন কী করে? প্রতি বছরেই তো প্রায় ৮০ হাজার কোটি টাকা চলে যায় ঋণ শুধতে। এর পরে কী হবে দিদি। গর্ত বোজাতে গিয়ে আরও আরও গর্ত খোঁড়া কি ঠিক হচ্ছে দিদি? □

# শাসকদলের মদতে পশ্চিমবঙ্গ এখন জেহাদিদের স্বর্গরাজ্য

**ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায়**

মধুকবির কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তিটি ব্যবহার করে একটি প্যারেডি তৈরি করলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটির ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
চোর, খুনি, জঙ্গিদের অবাধ বিচরণ।
যত্রতত্র হয় বোমা বিস্ফোরণ,
নারী ধর্ষণ চলে, দর্শক প্রশাসন!

পশ্চিমবঙ্গ এখন সমাজ বিরোধীদের স্বর্গরাজ্য। রাজ্যে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে। সাধারণ মানুষ ভীত, সন্ত্রস্ত, নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। বিশেষ করে হিন্দুরা। পশ্চিমবঙ্গে থাকা আর নিরাপদ মনে করছে না। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বুঝতে পেরেছিলেন যে সমগ্র বঙ্গ যদি পাকিস্তানের পেটে ঢুকে যায়, তাহলে হিন্দু অচিরেই বিলুপ্ত হবার পথে চলে যাবে, হিন্দুদের একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল দেবার জন্যই তিনি অখণ্ড বঙ্গের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিম অংশটি পাকিস্তানের গ্রাস থেকে ছিনিয়ে এনেছিলেন। আজ শ্যামাপ্রসাদের সেই পশ্চিমবঙ্গেও হিন্দুসমাজ অস্তিত্ব সঙ্কটে ভুগছে।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপূজার বিসর্জন দিন পরিবর্তন করে দেওয়া হয় মুসলমানদের অনুষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেবার জন্য। এবার তো সরস্বতী পূজাতেও চরম অশান্তি দেখলাম আমরা। মোল্লাবাদীরা সরস্বতী পূজা নিয়ে যা করলো, তা আমাদের স্মরণকালে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আরামবাগের একটি সরকারি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা সরস্বতী পূজা করতে চেয়েছিল। প্রধান শিক্ষক কাশীরাম বর্মণ অভিভাবকদের নিয়ে একটি মিটিং করেন তাঁদের মতামত জানার জন্য। অধিকাংশ অভিভাবক পূজার পক্ষে মতপ্রকাশ করেন। এই খবর জানার সঙ্গে সঙ্গে কিছু জেহাদি মুসলমান স্কুলে এসে প্রধান শিক্ষককে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে। তারা একথাও বলে যে সরস্বতী পূজা এই স্কুলে কোনোদিন হয়নি, তাই হবে না, অর্থাৎ করতে দেওয়া হবে না। তারা প্রধান শিক্ষককে হুমকি দেয় এ কথা বলে যে, এই স্কুলে পূজা হলে তারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রধান শিক্ষককে অন্যত্র ট্রান্সফার করে দেবে। এই স্পর্দ্ধা তারা পায় কোথা থেকে? এদের সাহস এতটাই বেড়ে গেছে যে হিন্দুপ্রধান দেশে হিন্দু প্রধান শিক্ষককে মুসলমান সমাজ বিরোধীর ভীতিপ্রদর্শন সহ্য করতে হয়। তিনি জানিয়েছেন যে এখন স্কুলে যেতেও ভয় পাচ্ছেন, এরা তাঁর ওপর হামলা না করে। ঘটনাটি মিডিয়ার দৌলতে প্রচারিত হওয়ায় উপর মহলের অনুগ্রহে ওই স্কুলে সরস্বতী পূজা হয় শেষ পর্যন্ত।

শুধু একটি স্কুলে নয়, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্কুল, কলেজে বিদ্যার দেবী সরস্বতীর আরাধনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হয়েছে। যোগেশচন্দ্র 'ল' কলেজে সরস্বতী পূজা করতে দেওয়া হবে না বলে মোল্লাবাদীরা ফতোয়া জারি করেছিল। শাসকদলের এক ছাত্রনেতা সাবির আলি ওই কলেজে সরস্বতী পূজা হবে না বলে ফতোয়া জারি করেছিল। পড়ুয়াদের শত আবেদন নিবেদনেও কাজ না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত আদালতের নির্দেশে কলেজে পূজা হয় তাও কড়া পুলিশ প্রহরায়। এরকম উদাহরণ অসংখ্য রয়েছে এরকম কয়েকটি কথা না বলে পারছি না। চোপড়ায় মা সরস্বতীর মূর্তি ভাঙা হয়েছে। বেলিয়াতোড়ের স্কুলে পূজা জেহাদিরা বন্ধ করে দিয়েছে। নদীয়ার একটি স্কুলে মা সরস্বতীর মূর্তি রাতের অন্ধকারে জেহাদিরা বিবস্ত্র করে পালিয়ে যায়, মূর্তির সারা অঙ্গে কামড়ের চিহ্ন দেখা যায়।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর রামনামে অ্যালার্জি আছে সবাই জানে, কিন্তু মা সরস্বতীর পূজা তো রামনবমী নয়, বজরঙ্গবলীর পূজাও নয়, ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর আরাধনা করে কারণ তিনি বিদ্যার দেবী। যেহেতু তারা বিদ্যার চর্চা করছে, তাই মা সরস্বতীর আশীর্বাদ তারা পেতে চায়, উপবাস করে থেকে অঞ্জলি দেয়, বইপত্র মায়ের পদপ্রান্তে রাখে। ছোটোবেলা থেকে মা সরস্বতীর পূজা দেখে এসেছি স্কুল-কলেজে, কিন্তু এখন দেখছি সেখানে পূজার জন্য আদালতে ছুটতে হয়, পুলিশ প্রহরায় পূজা করতে হয়। যোগেশচন্দ্র ল' কলেজে পূজার জন্য পুলিশের সঙ্গে র‍্যাফও পাহারা দেয়। তিন শিফটের পুলিশি ব্যবস্থা ছিল তা সত্ত্বেও সরস্বতী পূজা হচ্ছে না। লোকসভা না বিধানসভার নির্বাচনপর্ব চলছে বোঝা দায়। পশ্চিমবঙ্গ তো প্যালেস্টাইন, সিরিয়া বা বাংলাদেশ নয় যে এখানে মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ। আরামবাগের মোল্লাবাদীরা বলেছে স্কুলে সরস্বতী পূজার আমরা বিরোধী, কারণ আমরা কোনো প্রকার সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিই না।

বাংলাদেশে কী চলছে আমরা সবাই জানি। সেখানে পুলিশি পাহারায় পূজা হয়, কারণ সেদেশে হিন্দুরা সংখ্যালঘু, তাই তাদের সবকিছু সহ্য করতে হয়। মোল্লাবাদীরা সেখানে সংখ্যাগুরু, কাজেই তাদের মজহবের নির্দেশ অনুযায়ী কাফেরদের উপর অত্যাচার চালাতেই হবে। কিন্তু এদেশে তো হিন্দুরা সংখ্যাগুরু, অথচ পশ্চিমবঙ্গে এখন হিন্দুরা নানাভাবে আক্রান্ত হচ্ছে জেহাদিদের দ্বারা। তাদের দাপট দিন দিন বেড়েই চলেছে, কারণ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বিচারে মুসলমানরা দুধেল গাই, অতএব তাদের লাথিতো খেতেই হবে।

পশ্চিমবঙ্গকে গাজওয়াতুল হিন্দ বানাবার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। বোলপুরের একটি স্কুলে এ বছর সরস্বতী পূজার আগের দিন মুসলমান প্রধান শিক্ষক স্কুলের গেটে তালা লাগিয়ে চলে যান। পরদিনও স্কুল তালাবন্ধই ছিল। পূজা করা যায়নি। বাংলাদেশের 'আনসার উল্লা বাংলা' নামক একটি কুখ্যাত জঙ্গি সংগঠন পশ্চিমবঙ্গকে ভারত থেকে আলাদা করার ছক কষছে। এরা এই পশ্চিমবঙ্গে বেশ কয়েকটি স্লিপার সেল তৈরি করেছে। পশ্চিমবঙ্গের মাটি জেহাদিরা দখল করতে চায়। আনসার উল্লা বাংলার মূল পাণ্ডা জসিমুদ্দিন রহমানি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে খোলাখুলি বলেছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাহায্য করলে তারা পশ্চিমবঙ্গ দখল করতে সক্ষম। বাংলাদেশে ইউনুস ক্ষমতা দখলের পরেই কুখ্যাত

জঙ্গিদের জেল থেকে মুক্তি দিয়েছে, তারা চোরাপথে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকছে। ইউনুস ক্ষমতায় আসাতেই জঙ্গিদের পোয়াবারো।

খারিজি মাদ্রাসায় পশ্চিমবঙ্গ ভরে গেছে। যেখানে ছোটোদের জঙ্গি শিক্ষা দেওয়া হয়, হিন্দুদের বিরুদ্ধে মগজ ধোলাই করা হয়। প্রশাসনের প্রশ্রয় ছাড়া এ কাজ সম্ভব? এইসব মাদ্রাসায় কী পড়ানো হয়, সিলেবাসে কী কী আছে, প্রশাসন জানে না? পশ্চিমবঙ্গে এখন হিন্দু সংস্কৃতির সামনে চ্যালেঞ্জ নিয়ে হাজির জেহাদি সংস্কৃতি। মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দল মুসলমান সম্প্রদায়কে ভোটব্যাংক ছাড়া আর কিছু মনে করেন না, তাই জেহাদিদের বিরুদ্ধে তিনি কোনো অ্যাকশন নেন না। তাঁরই মন্ত্রীসভার বিশিষ্ট সদস্য এবং কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম সম্প্রতি বলেছেন 'যারা ইসলামে জন্মগ্রহণ করেনি, অর্থাৎ অ-মুসলমান, তারা দুর্ভাগা। তাদের ইসলামে দাওয়াত দিচ্ছি, তারা ইসলামে এলে আল্লাহর রহমত পাবে'। তিনি আরও একটি জনসভায় বলেন যে, 'এখন আমাদের সংখ্যালঘু বলা হয়, কিন্তু ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে যখন আমরা সংখ্যাগুরুদের থেকেও সংখ্যাগুরু হয়ে যাব।' এহেন বক্তব্যের পরেও মুখ্যমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নেননি। এই হাকিম সাহেবই কিছুদিন আগে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির পরাজিত মহিলা প্রার্থী রেখা পাত্রকে উল্লেখ করেন 'হেরো মাল'। তিনি হলেন কলকাতার মেয়র। সেই চেয়ারে আসীন যে চেয়ারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র বসু একদা আসীন ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের আর মনে হয় কিছু বাকি নেই।

শাসকদলের তুষ্টীকরণ নীতি ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই দল সংবিধান মানে না, আদালতের রায়কেও অগ্রাহ্য করে চলে। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের পশ্চিমবঙ্গে ঢোকার সব ব্যবস্থা করে দেয়, রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের বিভিন্ন জায়গায়, জেলায় জেলায়, এমনকী শহর কলকাতাতেও বিভিন্ন শিবিরে ওদের বসবাসের ব্যবস্থা করে দেয়। তৃণমূল দল তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছে। এখন তো ভুয়ো পাসপোর্ট, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড ইত্যাদি তৈরির হাব হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। তেহরিক উল মুজাহিদ্দিনের দলপতি জাভেদ মুন্সী কাশ্মীরের জঙ্গি কিছুদিন আগে ক্যানিং থেকে গ্রেপ্তার হয়েছে কাশ্মীর পুলিশের হাতে। জঙ্গিদের মুক্তাঞ্চল পশ্চিমবঙ্গ, এখানে তারা নিশ্চিন্তে থাকতে পারে।

হিন্দুদের আজ ঐক্যবদ্ধ হবার সময় এসেছে, নচেৎ পশ্চিমবঙ্গ অচিরেই পশ্চিম বাংলাদেশ হয়ে যাবে। এ বিষয়ে এই রাজ্যের ভাতাজীবী মেরুদণ্ডহীন সেলিব্রিটিরা মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। এখানেও ডিপস্টেট রয়েছে। তারা বিদেশের ফান্ডিঙের সাহায্যে ও লোভে দেশদ্রোহিতা করতে পিছপা নয়। এরা এদেশের খাবে, এদেশের পরবে, এদেশের পাসপোর্ট ব্যবহার করবে, আর বিদেশে গিয়ে দেশের বদনাম করবে। এই সব টুকরো টুকরো গ্যাঙের মধ্যে আরবান নকশাল, কিছু কংগ্রেসি নেতা এবং কমিউনিস্টরা রয়েছে। কমিউনিস্টরা ধর্মতলায় প্রকাশ্য দিবালোকে বড়ো রাস্তায় দাঁড়িয়ে হইহই করে গোমাংস খেয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা দেখায়। বিকাশ ভট্টাচার্য, সুবোধ সরকার এরা সকলেই হিন্দু কিন্তু গোমাংস খাওয়ার জন্য কৃতিত্ব দাবি করে। একইভাবে শুয়োরের মাংস খাওয়ার সাহস কিন্তু এরা দেখাতে পারেনি কোনোদিন, পারবেও না। কমিউনিস্ট নেতা মহম্মদ সেলিমকে এরা শুয়োরের মাংস খাওয়াবার ধৃষ্টতা কোনোদিনও করতে পারবে না। তিনি নিজে থেকেও এই কাজ কোনোদিন করতে পারবেন না। এখানেই হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য।

আরেকটি কথা, ধর্মনিরপেক্ষ হবার দায় শুধু হিন্দুদের, আর কারও এই দায় নেই। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীরা প্যালেস্টাইনের জন্য সাদ্দাম হুসেনের জন্য, কিউবা, নিকারাগুয়া এক সময়ের ভিয়েতনামের জন্য মিছিল করে। সাম্প্রতিককালে বামপন্থীরা 'বাংলাদেশ ও ভারতে সংখ্যালঘুর উপর অত্যাচার বন্ধ করতে হবে' এই লেখা সংবলিত ব্যানার নিয়ে মিছিল বার করেছে। এদের হিন্দুবিদ্বেষ অবিশ্বাস্য পর্যায়ের। আসলে হিন্দুরা soft target, তাদের সম্বন্ধে যা খুশি বলা যায়, যত খুশি অপমান করা যায়, কিন্তু মুসলমানদের উদ্দেশ্যে কিছু বললে, (সমালোচনা সূচক) 'সর তন সে জুদা' হয়ে যাবে, সেই ভয়টা তো আছে। কমিউনিস্ট, কংগ্রেস ও তৃণমূলিদের ধর্মনিরপেক্ষতা মানে হিন্দু বিদ্বেষ, সেই সঙ্গে দুধেল গাইদের তুষ্টীকরণ। সিপিএম-এর ২৪তম পার্টি কংগ্রেসের দলিলে টার্গেট সেই হিন্দু, জেহাদি বা সন্ত্রাসবাদীদের সম্বন্ধে কোনো কথা নেই।

'গজওয়াতুল হিন্দ' নাকি ইসলামের মন্ত্র, অথচ এই বিষয়ে দলিলে কোনো কথা নেই। এরা বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের হিন্দু হত্যা, মন্দির ধ্বংস করা, হিন্দুদের বাড়িঘর, সম্পত্তি লুটপাট, অগ্নিসংযোগের সঙ্গে এক সারিতে বসিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগুরুদের। কী সাঙ্ঘাতিক মিথ্যাচারিতা। এরা খুব ভালো করেই জানে যে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলির ডেমোগ্রাফি পালটে গেছে শুধু অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের কারণে। পশ্চিমবঙ্গের ছ' হাজার গ্রামে শাঁখ বাজানো নিষিদ্ধ। হিন্দুরা আজ মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুরে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। প্রায় প্রত্যেকদিন পশ্চিমবঙ্গের কোথাও না কোথাও ধর্ষণ ও খুন, গুলি চালানোর ঘটনা প্রকাশ্য দিবালোকে হয়ে চলেছে। যদি কখনো অপরাধী ধরা পড়ে, দেখা যায় সে বা তারা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক যারা 'জেহাদি' নামে খ্যাত বা কুখ্যাত, যারা বিশ্বাস করে বিধর্মীদের বিশেষ করে যারা মূর্তিপূজা করে, তাদের মারলে সরাসরি জন্নতে যাওয়া যাবে, বাহাত্তরটি হুরির সেবা পাওয়া যাবে।

**"...বাহির থেকে যখন প্রথম আঘাত নিয়ে এক মহম্মদ ঘোরী, কই, একত্র তো হইনি... যখন মন্দিরের পর মন্দির ভাঙতে লাগল, দেবমূর্তি চূর্ণ হতে লাগল, তখন তারা (হিন্দুরা) লড়েছে, খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ করে মরেছে। তখনও একত্র হতে পারল না। খণ্ডিত ছিলাম বলেই মেরেছে, যুগে যুগে এই প্রমাণ আমরা দিয়েছি।"**

জেহাদিরা তরবারির সাহায্যেই পৃথিবীর সাতান্নটি দেশ দখল করেছে। এবার তাদের টার্গেট ভারত, পশ্চিমবঙ্গ দখল করে হবে এর সূত্রপাত। আজ পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানরা বলে দেবে সরস্বতী পূজা হবে কী হবে না। রামনবমীর মিছিলে এরা পাথর ছুঁড়বে, লোক মারবে। এই সাহস তারা পায় কোথা থেকে? প্রশাসনের আশীর্বাদধন্য এরা। তাই এরা আজ বেপরোয়া।

রাজ্যপুলিশের এডিজি সুপ্রতিম সরকার নিজে বলেছেন যে রাজ্যপুলিশ খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছে যে জঙ্গিরা বিভিন্ন জায়গায় 'স্লিপার সেল' তৈরি করেছে। নামকরা কবি, সাহিত্যিক, সিনেমা থিয়েটার জগতের লোকজন এই সব জেনেও মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকে, সরকারি সুযোগ-সুবিধা বন্ধ হয়ে যাবার ভয় আছে কিনা। এদের ভণ্ডামির মুখোশ আজ খুলে পড়েছে। তাদের নীরব প্রশ্রয়েই জঙ্গিরা আশকারা পাচ্ছে। সেই সঙ্গে প্রশাসনের সমর্থন, যার ফলে জঙ্গিদের স্বর্গরাজ্য আজ পশ্চিমবঙ্গ। কয়েকশো কিলোমিটার বর্ডার খোলা, কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে ওয়াচ টাওয়ার ও কাঁটাতার বসাবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে জমি চায়, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী জমি দিতে অস্বীকার করেন। কারণ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ বন্ধ হলে তাঁর ভোটব্যাংকে টান পড়বে।

জামাতিরা পশ্চিমবঙ্গের কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়েছে। কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা অধীর চৌধুরীও বলেছেন যে, ওরা প্রথমে মুর্শিদাবাদ দাবি করবে, তারপর মালদা। পরিস্থিতি ভয়ানক। তিনি আরও বলেছেন— 'Be serious'। তৃণমূলের এক বিধায়ক হুমায়ুন কবীর কিছুদিন আগে এক প্রকাশ্য জনসভায় বলেছেন— মুর্শিদাবাদে আমরা ৭০ শতাংশ, হিন্দুরা ৩০ শতাংশ, ওদের আমরা দু' ঘণ্টার মধ্যে কেটে ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দিতে পারি। এই বক্তব্যের জন্য নেত্রী এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেননি। পাঁচবারের এমপি অধীর চৌধুরী এবারের লোকসভা নির্বাচনে গুজরাটের বাসিন্দা ইউসুফ পাঠানের কাছে পরাজিত হলেন। পাঠান পশ্চিমবঙ্গে কোনোদিন থাকেননি, বাংলা ভাষাও জানেন না, তাঁর পরিচিতি তিনি একজন প্রাক্তন ক্রিকেটার। তিনি পেলেন ৫ লক্ষ তেইশ হাজার পাঁচশো ছিয়াশিটা ভোট। অধীর চৌধুরী পেলেন চার লক্ষ আটত্রিশ হাজার, পাঁচশো তেইশটা ভোট। তিনি মুসলমানদের জন্য অনেক করেছেন, কিন্তু তাঁর নির্বাচন কেন্দ্রের ভোটাররা ইউসুফ পাঠানকে জেতালেন শুধুই তিনি একজন মুসলমান প্রার্থী বলে। বিপরীতে একজন হিন্দু প্রার্থী। এই ধর্মীয় একতাবোধ হিন্দুর নেই। কারণ তারা প্রগতিশীল, আধুনিক ও ধর্মনিরপেক্ষ। স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ বলেছিলেন যে হিন্দুর সব আছে, নাই শুধু একতাবোধ।

বাঙ্গালি হিন্দু আজও নিদ্রাচ্ছন্ন, নিজেকে 'হিন্দু' বলতে লজ্জাবোধ করে। 'হিন্দু' শব্দটার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পায়, রামনাম ভুলেও মুখে আনে না। 'জয় শ্রীরাম' যেখানে একটি গালি মনে করা হয়, তাই উচ্চারিত হয় না। এই লিবেরাল, বামপন্থী, তৃণমূলি, অতিবাম, কংগ্রেসিরা 'ইনশা আল্লা' শব্দবন্ধে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পায় না। এরা মূলত হিন্দু বিদ্বেষী। কারণ ভোটের ব্যাপারে অথবা শত্রুর মোকাবিলায় হিন্দু ঐক্যবদ্ধ নয়। এটা জেহাদিরাও জানে আর এই জানাটা তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছে অতীতে ও বর্তমানে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— 'মুসলমান যখন কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে মুসলমান সমাজকে ডাক দিয়েছে, সে কোনো বাধা পায়নি— এক ঈশ্বরের নামে 'আল্লা হো আকবর' বলে সে ডেকেছে। আজ আমরা যখন ডাকবো 'হিন্দু এসো'— তখন কে আসবে? ...বাহির থেকে যখন প্রথম আঘাত নিয়ে এক মহম্মদ ঘোরী, কই, একত্র তো হইনি... যখন মন্দিরের পর মন্দির ভাঙতে লাগল, দেবমূর্তি চূর্ণ হতে লাগল, তখন তারা (হিন্দুরা) লড়েছে, খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ করে মরেছে। তখনও একত্র হতে পারল না। খণ্ডিত ছিলাম বলেই মেরেছে, যুগে যুগে এই প্রমাণ আমরা দিয়েছি।"

'পাপের প্রধান আশ্রয় দুর্বলের মধ্যে। অতএব যদি মুসলমান মারে আর আমরা পড়ে পড়ে মার খাই— তবে জানব, এ সম্ভব করেছে শুধু আমাদের দুর্বলতা।' (রবীন্দ্রনাথের 'স্বামী শ্রদ্ধানন্দ' প্রবন্ধ থেকে, কালান্তর গ্রন্থে প্রকাশিত, মাঘ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে)।

হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ না হলে সমূহ বিপদ। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বের সঙ্কট। পাকিস্তানের আইএসআই, লস্কর-ই-তৈবা, বাংলাদেশের বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী সংস্থাগুলি পশ্চিমবঙ্গে এখন প্রচণ্ড সক্রিয়। সীমান্তবর্তী জেলাগুলি প্রায় হিন্দুশূন্য। নানা ধরনের অপরাধমূলক কাজকর্ম ওইসব অঞ্চল থেকেই প্ল্যান করা হয় এবং অবাধে সারা রাজ্যে অশান্তি ছড়ানো হয়। চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ, খুন, বোমাবাজি এই রাজ্যে অবাধে চলেছে কারণ অপরাধীরা যে শাসকদলের দুধেল গাই, ভোটব্যাংক। সুতরাং তাদের জন্য এই রাজ্য মুক্তাঞ্চল। অবৈধভাবে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে এরা অনেকেই সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। সব জেনেও বাঙ্গালি হিন্দু যদি ঘুমন্ত থাকে, যদি প্রতিবাদে শামিল না হয়, যদি ঐক্যবদ্ধ না হয়ে আবার পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে, তাহলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আবার তাদের উদ্বাস্তু হতে হবে। তাদের বাপ দাদাদের মতো পূর্ব পাকিস্তান থেকে যারা পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এসেছিলেন, নিরাপদ স্থল পশ্চিমবঙ্গে, এবার কিন্তু আর কোথাও ঠাঁই হবে না বঙ্গোপসাগর ছাড়া। □

## একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

**সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—**

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

# বাংলাদেশের হিন্দুরা স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের প্রদর্শিত পথেই চলছেন

**অসিত চক্রবর্তী**

বাংলাদেশ বলতে বাংলা ভাষাভাষীদের দেশ। দেশ গঠনের মূল প্রেরণা ছিল ভাষিক সত্তা রক্ষা। অথচ সেদেশের বাংলাভাষী হিন্দুরা সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাভাষী মুসলমানদের কাছে দীর্ঘদিন থেকে নির্যাতিত হয়ে আসছে। বাঙ্গালি হিন্দুদের মেরে-কেটে তাড়িয়ে সেভূমি ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পূর্ব পাকিস্তান নামে আত্মপ্রকাশ করে। তখন হিন্দুদের অপরাধ ছিল তারা পাকিস্তানের দাবির বিরোধিতা করেছিল। হিন্দুদের কাছে পাকিস্তানের সমর্থন আশা করা কী হাস্যকর নয়? তারপরও যিনি সমর্থন করেছিলেন সেই নমঃশূদ্র সমাজের নেতা যোগেন্দ্র মণ্ডল এবং তার সমাজের কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি, মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিয়ে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে হয়। এতকিছুর পরও যারা ভিটেমাটির মায়া ছেড়ে আসতে পারেননি তাদেরকে বলা হতো—কেন তারা যাননি? হিন্দুস্থানের হয়ে গুপ্তচরগিরি করতে, হিন্দুস্থানের পঞ্চম বাহিনী হতে? (অন্নদাশঙ্কর রায়)। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাভাষাকে সেদেশের সরকারি ভাষার মর্যাদা প্রাপ্তির দাবিতে আন্দোলন আরম্ভ হয়। এটা বাঙ্গালি হিন্দুদের চক্রান্ত ধরে নিয়ে আবার তাদের উপর নির্যাতন শুরু হয়। সর্বমোট ৩২ লক্ষ লোককে হত্যা করা হয়। এর মধ্যে ২৮ লক্ষ লোকই ছিলেন হিন্দু বাঙ্গালি। ১৯৪৬ সালে কলকাতা নরহত্যায় মৃতের সংখ্যা দশ হাজার ছাড়িয়ে যায়। তারপর নোয়াখালিতে একতরফা হিন্দুরা গণহত্যার শিকার হয়।

অকারণে কদিন পর পর সেখানে হিন্দুদের হত্যা, ডাকাতি, ধর্ষণ যেন জলভাত। ১৯৬৩ সালে কাশ্মীরের হজরত বাল মসজিদে মহম্মদের সংরক্ষিত একটি চুল নিখোঁজ হয়ে গেলে তার জন্যও বাংলাদেশে হিন্দুদের অত্যাচার সইতে হয়। অথচ এই ঘটনার সঙ্গে বাংলাদেশ কিংবা ভারতের কোনো হিন্দু জড়িত ছিল না। অনুরূপ ভাবে ২০২১ সালে কোরান শরিফ বইটি দুর্গাপূজা মণ্ডপে হনুমানের পায়ে ইকবাল নামক এক মুসলমান যুবক রেখে যায়। যা ভিডিয়ো ফুটেজে ধরা পড়ে। কিন্তু তা প্রমাণিত হবার আগেই তারা হিন্দুদের দুর্গাপূজা ভণ্ডুল করে, মঠ মন্দির ভেঙে দেয়। সম্প্রতি বাংলাদেশে তাদের কোটা সিস্টেম পরিবর্তনের দাবি করে যে জেহাদি ছাত্র আন্দোলন হলো তাতেও হিন্দুরা ধরাছোঁয়ার মধ্যে ছিল না। অথচ রাজনৈতিক পালাবদলের বাস্তবায়নে হিন্দুদেরই বলির পাঁঠা বানানো হলো।

প্রায় ৮০ বছর ধরে একটানা হিন্দুদের উপর নির্যাতনের ইতিহাস থাকলেও কেউ সেটার প্রতিবিধানের কথা মাথায় আনেননি। পরাধীন ভারতে সবাই ব্যস্ত ছিলেন আগ্রাসী ব্রিটিশ ও খ্রিস্টানদের হাত থেকে ভারতকে বাঁচাতে। হিন্দু নেতৃত্ব সে কাজে উঠে পড়ে লেগেছিল। মুসলমান শাসনের পতন হলেও চোখের সামনে ব্রিটিশদের আধিপত্য তাদের ভাবিয়ে তুলেছিল। নিজের ধর্ম-সংস্কৃতি রক্ষায় তাদের প্রয়াস মূলত ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত ছিল। কিন্তু অলক্ষ্যে ইসলামিক শক্তি যে ধীরে ধীরে ঘরগুছিয়ে নিচ্ছিল, তাঁরা সেটা বুঝলেও, অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। ১৯০৬ সালে মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা তারই সত্যতা নিশ্চিত করে। মাথাচাড়া দেওয়া সেই ইসলামি জেহাদিদের ব্যভিচার ও পেশীশক্তির আস্ফালনের কালো দিনগুলোতে সাধারণ মানুষের কাছে ত্রাতা হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। প্রতিবিধান, প্রতিরোধ ও হিন্দুজাতির আত্মরক্ষার তাগিদে সারা বঙ্গভূমি ছুটে বেড়িয়েছিলেন। ডাক দিয়েছিলেন হিন্দু মহাসমন্বয়ের। শুরু করেছিলেন হিন্দু মিলন মন্দির আন্দোলন। ঠিক যেভাবে শ্রীচৈতন্য ইসলামি রাজশক্তির ব্যভিচারের বিরুদ্ধে নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে ভক্তি আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) পরবর্তী সময়ে হিন্দু যুবসমাজের পাখির চোখ ছিল তখন খ্রিস্টান মিশনারিদের উপর। কলেজ পড়ুয়ারা তখন গলায় ক্রুশ পড়তে শুরু করেছিল। গোমাংস খেয়ে সে সময়কার নব্যপ্রজন্মরা চার্চের দিকে ধাবিত হয়। ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন শুরু হলো। উনিশ শতকের বঙ্গের হিন্দু জাতীয়তাবোধকে পুনরুজ্জীবিত করতে প্রথম এগিয়ে এলেন রামমোহন (১৭৭২-১৮৩৩)। জাতীয়তাবোধের জাগরণে রামমোহনের অবদান এবং সেই সময়ের অবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, '—রামমোহন রায় যখন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন তখন এখানে চতুর্দিকে কালরাত্রি অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল। আকাশে মৃত্যু বিচরণ করিতেছিল। মিথ্যা ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল।' মুঘল পরবর্তী ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে অবসন্ন হিন্দু সমাজের পুনরুজ্জীবনে তাঁর সংগ্রাম চিরস্মরণীয়। এরপর যুগপোযোগী সমাজ রক্ষায় বিদ্যাসাগর (১৮২১-১৮৯১) এগিয়ে এলেন।

রাজনারায়ণ বসু ১৮৬১ সালে হিন্দুসমাজের চৈতন্য আনয়নে গঠন করলেন 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা'। এরপর গঠন করেন 'মহাহিন্দু সমিতি'। উদ্দেশ্য একটাই, হিন্দু

**স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের প্রেরণা ও পথনির্দেশ আজও বাংলাদেশের হিন্দুদের সঞ্জীবনী মন্ত্র। বাংলাদেশে আজ রুখে দাঁড়ানো হিন্দুসমাজের শক্তিকেন্দ্র স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ।**

যুবকদের মনে নিজ ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতি আস্থা প্রতিষ্ঠা। এই ভাবে আনন্দমোহন বসু, কেশবচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৮৪) সেন থেকে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। জাতীয় জাগরণে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী ভুলবার নয়। তাঁর কথায়— '...আমি হিন্দু, তুমি হিন্দু, রাম হিন্দু, যদু হিন্দু, আরও লক্ষ লক্ষ হিন্দু আছে। তাই লক্ষ লক্ষ হিন্দুর যাহাতে মঙ্গল, তাহাতেই আমার মঙ্গল। যাহাতে তাহাদের মঙ্গল নাই, আমারও তাহাতে মঙ্গল নাই। অতএব সকল হিন্দুর যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই আমার কর্তব্য। যেমন আমার এইরূপ কর্তব্য আর অকর্তব্য, তোমারও তদ্রুপ, রামের ও তদ্রুপ, যদুরও তদ্রুপ, সকল হিন্দুরই তদ্রুপ'।

এরপরই স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব (১৮৬৩-১৯০২)। নরেন্দ্র থেকে বিবেকানন্দে উন্নীত হতে হতে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন ভারতের পথভ্রষ্ট যুবকদের দুর্দশা। বিজাতীয় দম্ভ। কখনো ক্রুদ্ধ বিবেকানন্দকে দেখা গেল, গৈরিক পাঞ্জাবি এঁটে ব্রজমুষ্ঠিবদ্ধ হাতে ইংরেজ সাহেবকে জবাব দিতে। আবার কখনো মুখের উপর প্রত্যুত্তর ছুঁড়ে দিতে। যাকে বলে বীর সন্ন্যাসী। তিনি বুঝেছিলেন বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে হিন্দুধর্মের জয়ধ্বজ উত্তোলন না করলে ভারতের যুবকদের আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবে না। তাই করে দেখিয়েছেন।

কিন্তু বিবেকানন্দ পরবর্তী ভারতবর্ষে ভারতের পরিস্থিতি এক জটিল রূপ ধারণ করে। একদিকে ব্রিটিশদের বিদায়ের পালা, স্বাধীন ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তরের কূটনৈতিক চক্রান্ত। অন্যদিকে জেহাদি শক্তির উত্থান। এই জটিলতর কঠিন পরিস্থিতির সময় আবির্ভূত হন স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। ঠিক যেভাবে ধর্ম রক্ষায় এক এক সময়ের আহ্বানে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ কিংবা শ্রীচৈতন্য। রামদাস স্বামীর আবির্ভাব ইসলামি ভারতের যেমন এক ক্রান্তিকারী ঘটনা। যার আদর্শে উদ্বুদ্ধ শিবাজী মহারাজ, হিন্দুদের একত্রিত করে সেসময়ে স্বাধীনতা ও স্বরাজের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছিলেন। তাঁদের অবর্তমানে স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ দেশভাগের জটিলতার পরিস্থিতিতে, হিন্দু সমাজকে বাঁচার প্রেরণা দিয়েছিলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে একাধারে সংগ্রাম করতে হয়েছিল ইসলামি শাসক শক্তির বিরুদ্ধে। অন্যদিকে লড়তে হয়েছিল জাতিভেদের বিরুদ্ধে। আচণ্ডালে হরিনাম বিলিয়ে ভেদাভেদ মুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ হিন্দুসমাজ রচনা করেছিলেন। কাজির হিন্দুবিরোধী শাসননীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাঠে সঙ্ঘবদ্ধ হিন্দুসমাজকে নামিয়ে ছিলেন। এই দুঃসাহসিক কাজে হরিনাম সংকীর্তন ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। সেরূপ স্বামী প্রণবানন্দজীকেও লড়তে হয়েছিল একাধারে ইসলামিক জেহাদিদের বিরুদ্ধে, আবার অন্যদিকে সমাজে প্রচলিত জাতপাতজনিত ভেদভাবের বিরুদ্ধে। এছাড়াও লড়তে হয়েছিল, নিজ সমাজে মাথা তুলে দাঁড়ানো মেকি-সেকুলারবাদী ও সুবিধাবাদী রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে। এই ত্রিমুখী লড়াইয়ের মোকাবিলাতে তাঁর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার 'হিন্দু মিলন মন্দির'। শুরু করেছিলেন হিন্দু মিলন মন্দির আন্দোলন।

স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর পূর্বসূরিদের লড়তে হয়েছিল ইংরেজ সাহেব-সুবোদের অবজ্ঞা ও শোষণ ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে। স্বামী প্রণবানন্দজীকে ছোটোবেলা থেকেই লড়তে হয়েছিল আগ্রাসী ইসলামের বিরুদ্ধে। তাঁর জন্মস্থান বাজিতপুরে এক মুসলমান গুন্ডাকে সবাই ভয় পেত। হিন্দুদের অকারণে প্রায়ই মারবে বলে ভয় দেখাত ও শাসাত। তার বাড়বাড়ন্ত বিনোদের (স্বামীজীর ছোটোবেলার ডাকনাম) কানে গেলে বাজারের রাস্তায় সে গুন্ডাটির পা দুটো ধরে শূন্যে তুলে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। সেদিনের পর থেকে উপদ্রবের স্থায়ীভাবে অবসান ঘটলো।

ছেলেদের নিয়ে আর্ত-পীড়িতদের সেবা, দুর্যোগ, মহামারীতে, সেবা কাজের মাধ্যমে নিজের ধর্ম-সংস্কৃতি রক্ষায় এক বাহিনী গড়ে তুললেন। তাই ১৯২৩ সালে মাঘী পূর্ণিমার দিনে 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ' নামে আত্মপ্রকাশ করে। নাম নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, সঙ্ঘ— শক্তিসূচক শব্দ, সমগ্র ভারতের কর্মক্ষেত্র তাই ভারত এবং সেবাই সঙ্ঘের কার্য— ত্যাগী পুরুষদের দ্বারা কার্যপালনের এই আশ্রমের নাম হলো 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ'। তবে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্থাপনা প্রণবানন্দজীর অবিস্মরণীয় কীর্তি নয়। এরকম আরও অনেক সংগঠন অন্য কেউ করতে পারতো বা করেছে। তাঁর কালজয়ী ঐতিহাসিক কীর্তি হলো হিন্দু মিলন মন্দির স্থাপন ও মিলন মন্দির আন্দোলন। ইসলামি ধর্মোন্মাদের উন্মুক্ততার মুখে হিন্দু সমাজের রক্ষায় কেউ কোনো ধর্মীয় সংগঠন গড়ে তোলেননি। বরং খ্রিস্টান আগ্রাসন রুখতে ব্রাহ্ম সমাজের মতো শাখা সংগঠন তৈরি হয়েছে। সে একই উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্য সমাজ। এতে একসময় প্রভাবশালী, শিক্ষিত, শক্তিশালী হিন্দুরা দলে দলে বৃহত্তর হিন্দুসমাজ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল। রামকৃষ্ণ মিশনও তো একসময় নিজেদের হিন্দু পরিচয় আড়াল করতে চেয়েছিল। এখানেই স্বামী প্রণবানন্দজীর অভিনবত্ব। সাম্প্রদায়িকতার বদনাম, সংকীর্ণতার অপলাপ কোনো কিছুই তাঁকে সত্য ও বাস্তবতা থেকে সরাতে পারেনি। তাঁকে সামান্য সময়ের জন্যও লক্ষ্যচ্যুত করাতে পারেনি। তাই মিলন মন্দির আন্দোলন শুরু করে স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ বললেন,—''আমি তাই হিন্দুকে হিন্দু বলে ডাক দিতে চাই। আমি সমগ্র হিন্দু জনসাধারণকে 'আমি হিন্দু', 'আমি হিন্দু' জপ করাবো। এই হিন্দুত্ববোধ জাগার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিলুপ্ত তেজোবীর্য, শক্তিসামর্থ্য জেগে উঠবে।''

১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের পর ১৯০৬ সালে মুসলিম লিগের আত্মপ্রকাশ। এরপরই সারা ভারতে বিশেষ করে বঙ্গপ্রদেশ সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে ভরে উঠে। পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি লক্ষ্য করে, ১৯৩৪ সালে বাজিতপুর সিদ্ধপীঠে প্রণবানন্দজী মহারাজ হিন্দু জাতিগঠনের সংকল্প করলেন। কখনো নৌকায়, কখনো ট্রেনে করে গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে প্রচার কাজে বেরিয়ে পড়লেন। স্থানে স্থানে মিলন মন্দির তৈরি হতে থাকলো। বিশাল হিন্দু সম্মেলন শুরু হলো। এই আন্দোলন তাঁর অনুগামীদের মধ্যে কারও কারও সংশয় রয়েছে দেখে প্রণবানন্দজী বললেন— আমি কোনো ভীরু কাপুরুষকে আমার সঙ্গে নেবো না, যে মাথা দিতে পারে ও মাথা নিতে পারে, সেই আমার সঙ্গে আসুক। নমঃশূদ্র, মুচি, পাটনি, কপালি কোনো গ্রাম বাদ নেই। অনগ্রসর হিন্দুদের আতিথেয়তা ও মিলনে এক মহামিলনের সূচনা করলেন।

একবার চাঁদসীতে এক নমঃশূদ্র ডাক্তারের বাড়িতে হঠাৎ গিয়ে দাওয়াতে বসেই তিনি বললেন— 'ঘরে কী আছে নিয়ে আয়, ভীষণ

খিদে পেয়েছে।' বাড়ির কর্তা-গিন্নিতো শ্রদ্ধা ভক্তিতে বিস্ময়ে হতভম্ব। ঠিক যেমন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হঠাৎ করে শ্রীধরের বাড়িতে ঢুকে কলসী থেকে ঢক ঢক করে জল খেয়ে নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'হিন্দু কখনো হিন্দুর নিকট অস্পৃশ্য হতে পারে না। অনাচরণীয় হতে পারে না। শাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিগণ কদাচ একথা স্বীকার করেননি।' চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ফেণী, চৌমূহনী, চাঁদপুর, কুমিল্লা, পাবনা, রাজশাহী, মালদহ প্রভৃতি স্থানে স্থানে সংগঠন ও হিন্দু সম্মেলনের পর তার ঢেউ এসে পড়লো কলিকাতায়। ১৯৩৮ সালের ২৬ আগস্ট কলিকাতার বালিগঞ্জে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক বিশাল হিন্দু সম্মেলনে আহূত হয়। সেদিন ছিল জন্মাষ্টমী। দুষ্টের দমনকারী ও হিন্দু জাতি সংগঠক শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তিথি। স্বামী প্রণবানন্দজী সারাদিন সাধনার পর বিকেলবেলা শ্যামাপ্রসাদ আসতেই মঞ্চে তাঁকে সোজা নিয়ে গিয়ে তাঁর নিজের গলায় থাকা মালাটি খুলে শ্যামাপ্রসাদের গলায় পরিয়ে দেন। রাতের বেলা একান্তে তাঁর প্রিয় ভক্ত স্বামী বেদানন্দজীকে বললেন— আমি আজ হিন্দু সমাজের জন্য নেতা ঠিক করে দিলাম। প্রণবানন্দজীর সেদিনের আশীর্বাদ বৃথা হয়ে যায়নি। বর্তমান ভারতে হিন্দুত্ববাদী শক্তির উত্থান সে নেতার হাত ধরেই যে হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। এরপর কাশীতে দুর্গাপূজার সময় এই গুরু ও ভক্তের বহুক্ষণ একান্তে আলাপ হয় ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিশ্চিত করা হয়।

১৯৩৮ সালে কুমার সিংহ হলে এক সম্মেলনে কলিকাতার হিন্দু নেতৃবৃন্দ এ বিশিষ্ট হিন্দু নাগরিকদেরকে নিয়ে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে সঙ্ঘ কর্মীগণ বিভিন্ন জেলায় হিন্দু নির্যাতনের অভিজ্ঞতা বর্ণনাপূর্বক তুলে ধরেন। এই সভায় প্রণবানন্দজী 'বিপন্ন হিন্দুর আত্মরক্ষার উপায়' সম্বন্ধে কিছু সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করার পর হিন্দু নেতৃবৃন্দের মনে চৈতন্য ও উৎসাহ সঞ্চারিত হয় তিনি বলেন, '...আমি আবারও বলি— মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুর সংগঠন নয়। আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুকে প্রস্তুত হইতে হইবে। আত্মরক্ষার্থে শক্তিসংগ্রহের উপায়— হিন্দু সঙ্ঘশক্তি সংগঠন। হিন্দু সঙ্ঘশক্তি সংগঠনের জন্য চাই উন্নত ও অনুন্নত যাবতীয় শ্রেণীর হিন্দু জনসাধারণের মিলন। ...এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী রূপদানের জন্য আমার 'হিন্দু মিলন মন্দির' কর্মপদ্ধতি'। এই রকম অসংখ্য সভা সমিতি একনাগাড়ে চলতে থাকে। কয়েকটি সভায় উপস্থিত ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এমএন মুখার্জি, স্যার নীলরতন সরকার, স্যার ইউএন ব্রহ্মচারী, মি: বিসি চ্যাটার্জি;, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, দীনেশচন্দ্র সেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

সেসময়ে দেশ বিভাজনকে কেন্দ্র করে মুসলিম লিগের ভিত শক্ত হলো। ১৯৪৩ সালে মুসলিম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ স্থাপিত হলো। প্রাদেশিক নির্বাচনে বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী পদে বসলেন সুরাবর্দি। কলিকাতা দাঙ্গা ও নোয়াখালি দাঙ্গাবাজদের হাত শক্ত হলো। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে মোল্লাবাদীদের জয় যে নিশ্চত তা লিগপন্থী নেতার মুখে ফুটে বেরোলো— We also have a pistol and are in position to use it. কলকাতার মেয়র মহম্মদ ওসমান সক্রিয়ভাবে এই দাঙ্গা পরিচালনা করেন। ২৪টি পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সবকটি থেকেই হিন্দু পুলিশ অফিসারদের সরিয়ে তাদের জায়গায় বাইশটিতে মুসলমান অফিসার এবং বাকি দুটিতে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পুলিশ অফিসার নিয়োগ করা হলো। কলিকাতা দাঙ্গায় নিহত হলো পাঁচ হাজার মানুষ ও আহতদের সংখ্যা পনেরো হাজার ছাড়িয়ে গেল। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই পরিকল্পনা মাফিক হিন্দু নিধন কর্মসূচি শুরু হয়। কিন্তু লিগপন্থীদের হতবাক করে দিয়ে পরদিন পালটা প্রতিরোধ শুরু হলো হিন্দুদের তরফ থেকে। এই পালটা প্রতিরোধের নায়ক ছিলেন মাংস বিক্রেতা গোপাল মুখোপাধ্যায়ের। পুলিশ ও সামাজিক বাহিনী নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছিল। প্রতিরোধের তীব্রতা দেখে শেষে তাদের নামানো হলো। বরাবর না হলেও বড়োসড়ো ধাক্কা খেল মুসলিম লিগ। কলকাতা দাঙ্গা ব্যর্থ হলো।

প্রণবানন্দজীর হিন্দু মিলন মন্দির আন্দোলন, হিন্দু রক্ষীদল আন্দোলন এবং তেজোদ্দীপ্ত ভাষণে তাঁর আহ্বান বাণী ইতিমধ্যে বঙ্গের গ্রাম শহরকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসীগণের বীর ভাবোদ্দীপক আরতি সবার যেন চোখে চোখে ভাসছিল। হয়তো এরই প্রভাবে প্রভাবিত, এই আহ্বান বাণীতেই উদ্বুদ্ধ গোপাল মুখার্জি সেদিন দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন রাস্তায়। প্রতিরোধের উপকরণও সে সংগ্রহ করে রেখেছিল। সেই ভাবেই অনুপ্রাণিত গোপাল আমেরিকান সৈন্যদের কাছ থেকে আগেভাবেই আগ্নেয়াস্ত্র জোগাড় করে রেখেছিলেন। গোপাল সে কাজটাই করেছে। সময়মতো তার ব্যবহার করে কলিকাতাকে সমূহ বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়ে নজির সৃষ্টি করেছে। এসব কিছুর প্রেরণা পুরুষ হলেন স্বয়ং শিবাবতার স্বামী প্রণবানন্দজী।

নোয়াখালিতে দাঙ্গা অবধারিত ছিল। গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং ব্যর্থ হয়ে যাবার পর এটা ছিল শেষ কামড়। বিধায়ক গোলাম সরওয়ার সে কাজের যোগ্য নেতৃত্ব দেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা অনেক আগেই সেখানে সভা সমিতি করেছিলেন। দাঙ্গার আগের দিন পর্যন্ত গুপ্ত পরামর্শ করেছেন। রাজেন্দ্রলালা রায়চৌধুরীর বাড়িতে রাত্রিবাস করেছেন। পরিকস্পনা যথাযথই হয়েছিল। তাই মুসলমান আক্রমণকারীরা আক্রমণ করতে এসে তিনবার ব্যর্থ হয়ে পালিয়ে যায়। ত্রিশ চল্লিশ জনের মতো মুসলমান গুন্ডাকে প্রাণ হারাতে হয়। সবই ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু জেহাদিরা দলে ভারী ছিল না। চতুর্থবার দশ হাজার জেহাদি আক্রমণ করতে এলে সব প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। গুলি শেষ হয়ে যায়।

বর্তমান বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি হিন্দুদের জন্য আরও বিপজ্জনক। সে দেশ আজ জেহাদিদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। রক্তপিপাসুদের জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সরকার, পুলিশ, প্রশাসন সব তাদের। হিন্দুদের ওপর নির্যাতন চরমে উঠেছে। জোর করে চাকরি থেকে হিন্দুদের ইস্তফা দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। এত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও হিন্দুরা রাস্তায় প্রতিবাদী আন্দোলন বের করছে। পালটা হুমকি দিচ্ছে। কোথাও কোথাও শক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। চিন্ময় প্রভুর মতো হিন্দু নেতা সামনে বেরিয়ে এসেছে। স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের প্রেরণা ও পথনির্দেশ আজও বাংলাদেশের হিন্দুদের সঞ্জীবনী মন্ত্র। বাংলাদেশে আজ রুখে দাঁড়ানো হিন্দুসমাজের শক্তিকেন্দ্র স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। তাঁর নির্দেশিত পথেই হাঁটছে বাংলাদেশের হিন্দুরা। □

# ভারতবর্ষ একটি ব্যতিক্রমী দেশ

**অমলেশ মিশ্র**

ভারতবর্ষ দেশটি ইন্ডিয়া নয় এবং আমরাও ইন্ডিয়ান নই। আমাদের শিক্ষায়তনগুলিতে ভারতের ইতিহাস পড়ানো হয়, ভারতীয়দের ইতিহাস নয়। ভারতীয়দের ইতিহাস লিখলে তা অন্যরকম হতো। সেই আলেকজান্ডারের সময় থেকে (৩০০ খ্রি.পূ.) ১৯৪৭ পর্যন্ত অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনকাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২২০০-২৩০০ বছর ব্যাপী ভারতীয়রা নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছেন। কোটি কোটি মানুষের প্রাণ গেছে। তবু ভারতীয়রা গ্রিক, শক, কুষাণ, হুন, ইসলাম ও খ্রিস্টান মতের অনুসারী হয়নি। বিশ্বে এ ঘটনা অন্য কোনো দেশের ক্ষেত্রে বলা যায় না। যাবতীয় প্রাচীন সভ্যতা হয় ইসলাম অথবা খ্রিস্টানদের কাছে মাথা নত করেছে, পদানত হয়েছে। সে দেশগুলি গ্রিস, রোম, মেসোপটেমিয়া, মিশর বা যে নামেরই হোক না কেন। সে দেশগুলির প্রাচীনত্ব আছে কিন্তু তার ধারাবাহিকতা নেই।

ভারতবর্ষ একমাত্র দেশ— যার প্রাচীনত্ব আছে এবং ধারাবাহিকতা আছে। ওই দেশগুলির antiquity আছে Continuity নেই। ভারতের antiquity এবং Continuity দুটোই আছে। বিশ্বে এইটি ব্যতিক্রমী দেশ। ভারতবর্ষের জাতীয়তা তার সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। পরাধীনতার থেকে মুক্তি পাওয়ার সংগ্রাম যদি স্বাধীনতার সংগ্রাম হয় তাহলে ভারতবর্ষে ৩২৩ খ্রি.পূ. থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত সবটাই স্বাধীনতার সংগ্রাম— নিজ দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার সংগ্রাম অবশ্যই স্বাধীনতা সংগ্রাম। এই স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যই ভারতবর্ষ গ্রিস, রোম, মিশর প্রভৃতি প্রাচীন দেশের মতো নিজেদের ধর্ম-সংস্কৃতি রক্ষা না করে বিদেশি ধর্ম সংস্কৃতির কাছে পদানত হতো। কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতাই একমাত্র স্বাধীনতা নয়।

ভারতবর্ষে সকলের ভোটাধিকার ব্যবস্থা প্রচলিত। এই ব্যবস্থা অনুসারে ১৮ বছর বয়স হলেই ভোটার হওয়া যায়। আমাদের দেশ ভারতবর্ষে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যবস্থায় যে প্রার্থী সর্বাধিক ভোটারের সমর্থন পান তিনি জন প্রতিনিধি হয়ে যান। আমাদের দেশ ভারতবর্ষে অনেকগুলি রাজনৈতিক দল আছে। নির্বাচনে যে রাজনৈতিক দলের বেশি প্রার্থী জয়ী হন, সেই দল সরকার গঠন করে। কখনো কখনো একাধিক দল একত্রিত হয়েও সরকার গঠন করতে পারে। একটি সরকারের কার্যকাল সাধারণত পাঁচ বছর।

ভারতবর্ষে হিন্দুর জনসংখ্যা বেশি এবং সেই কারণে ভোটার সংখ্যা বেশি। মুসলমানদের লোকসংখ্যা কম, সে কারণে ভোটার সংখ্যা কম। সারা দেশে হিন্দু ভোটার সংখ্যা যদি ১০০-র মধ্যে ৭৫ হয়, মুসলমান ভোটার সংখ্যা ১০০-র মধ্যে ২৫। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে মুসলমান ভোটার সংখ্যা অনেক বেশি। ১০০ ভোটারের মধ্যে প্রায় ৩৪ জন মুসলমান ভোটার। রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা আসনের মধ্যে প্রায় ৬৪-৬৮টি আসনে মুসলমান ভোটাররাই নির্ণায়ক ভূমিকায়।

হিন্দুদের জনসংখ্যা লোক এবং ভোটার সংখ্যা বেশি হলেও তারা অনেকগুলি ছোটো বড়ো দলে বিভক্ত। ওই ৭৫টি ভোট অনেক জনে বিভক্ত হয়। কেউ পায় ২৫, কেউ ২০, কেউ ১০, কেউ ৫ অর্থাৎ কেবলমাত্র হিন্দু ভোটে নির্বাচনে জয়ী হওয়া যায় না যেহেতু ওই ভোট বহু ভাগে বিভক্ত হয়।

অপরদিকে মুসলমান ভোট খুবই সঙ্ঘবদ্ধ। ২৫টি ভোটের ২০ হয়তো একটি দল পেল, ৫টি ভোট এদিক চলে গেল। ওই সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য হলো যেখানে বা যে দেশে তারা সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত ভাবে কম, সেখানে বা সেই দেশে তারা খুব ঐক্যবদ্ধ থাকে। ফলে তাদের ভোটের ভাগাভাগি কম হয়। তবে কেন ঐক্যবদ্ধ থাকে তার কারণ গভীর এবং পৃথক। এই প্রবন্ধে তা আলোচ্য নয়। হিন্দু জাতি প্রভাবিত রাজনৈতিক দলগুলি জানে যেহেতু হিন্দু ভোট বিভক্ত তাই তাদের উপর বেশি নির্ভর করা যায় না। ক্ষমতায় বা সরকারে যেতে গেলে মুসলমানদের ভোট একান্ত প্রয়োজন।

ঠিক এই সূত্র থেকেই, ভারতে মুসলমান সম্প্রদায়কে ক্ষমতা পিয়াসী ও ক্ষমতা দখলকারী দলগুলি অনেক বেশি সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারটাকে আমরা বলি তোয়াজ করা বা তোষণ করা। এই কারণেই এই দেশ প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারল না। ধর্মনিরপেক্ষ দেশ— হজ করতে যাওয়ার জন্য অনুদান দেয় না বা দেশের আইন থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের জন্য বিশেষ আইন মানে না বা ইমাম- মোয়াজ্জিমদের ভাতা দেয় না।

মুসলমান ভোটাররা ঐক্যবদ্ধ থাকেন সম্প্রদায়গত (ধর্মগত) কারণে। তারা হিন্দু প্রভাবিত রাজনৈতিক দলগুলির দুর্বলতা বোঝেন ও জানেন, তাই তাঁরা লক্ষ্য রাখেন— ১. কোন দল ক্ষমতায় গেলে সম্প্রদায়গতভাবে তারা বেশি সুবিধা পাবেন, ২. কোন দলের সরকার গঠন বা ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই দুইটি দিকে নজর দিয়ে তারা তাদের ঐক্যবদ্ধ ভোটের দিক নির্দেশ দেন। সাধারণত ওই সম্প্রদায়ের নেতারাই এই বিষয়টি স্থির করেন। কোনো মুসলমান রাজনৈতিক নেতা বিষয়টি স্থির করেন না। স্থির করেন মোল্লা- মৌলভিরা। লক্ষণীয় যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমস্ত দলের মুসলমান জনপ্রতিনিধিরা একই সুরে কথা বলেন। অথচ হিন্দু জাতির স্বার্থ বিষয়ক কোনো বিষয়ে সব দলের হিন্দু প্রতিনিধিরা এক সুরে কথা বলেন না। অথচ দেশটা হিন্দু জাতি প্রধান। এদেশের জাতীয়তা হিন্দুদের এদেশের সংস্কৃতিও হিন্দু। এদেশের মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দু কর্তৃত্ব মানবেন না বলেই নিজেদের জন্য পৃথক রাজ্য চেয়েছিলেন, পেয়েছেনও।

মুসলমানদের সম্পর্কে ভালো করে জানতে হলে কোরান ও হাদিশ পড়া ও বোঝা দরকার। আমাদের দেশের নেতারা মনে হয়, না পড়েন হিন্দুশাস্ত্র, না পড়েন ইসলাম গ্রন্থ। তাই তারা যা খুশি বলেন— যা বললে তাদের ক্ষমতা ভোগের কোনো ব্যাঘাত না হয়। দেশ বা জাতির ক্ষতি তারা বিশেষ গুরুত্ব দেন বলে মনে হয় না।

চোখের সামনেই তারা দেখছেন যে দিল্লির সংসদ ভবনেই হোক বা বর্ধমানেই হোক, যারা সন্ত্রাস করেছে তারা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের। তবু তারা বলেন যে— সন্ত্রাসবাদীর কোনো ধর্ম নাই। যেন তারা সব ধর্মগ্রন্থ পড়ে নিয়েছেন। আবার এরাই দারা সিংহের সঙ্গে এক খ্রিস্টান পাদরির গণ্ডগোলে দারা সিংহকে বললেন— হিন্দু সন্ত্রাসবাদী, অর্থাৎ তারা বলতে চান— সন্ত্রাসবাদী যদি মুসলমান হয় তখন বলতে হবে— সন্ত্রাসবাদীর কোনো ধর্ম নাই। আর কোনো হিন্দু যদি খ্রিস্টান বা মুসলমানের বিরুদ্ধে কিছু করে, তখন তার জাত আছে, সে হিন্দু সন্ত্রাসবাদী।

বোঝাই যাচ্ছে— ১. তারা মুসলমান ভোটের লোভে মুসলমানদের করা সন্ত্রাসকে লঘু করে দিতে চান, তাদের এই সন্ত্রাসবাদের উৎস কোথায়, তা জানার কোনো সদিচ্ছাও এদের নাই। ২. তারা হিন্দু শাস্ত্র, খ্রিস্টান রিলিজিয়ন ও ইসলাম মজহব সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল নন। ৪. যা বললে ও করলে ক্ষমতা ভোগের ব্যাঘাত হবে না, তাই-ই বললেন এবং করবেন। এই সব ভোট ভিখারিদের নিয়ে দেশ ভালো ভাবে চলে না। হিন্দু বা মুসলমান বা অন্য কারুরই কোনো স্থায়ী উপকার হয় না। এই ধরনের নেতৃত্ব থেকে দেশকে মুক্ত করা দরকার। □

# বিস্মৃত প্রথম ভাষাসৈনিক ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও একুশে ফেব্রুয়ারি

**ড. বিনয়ভূষণ দাশ**

একুশে ফেব্রুয়ারি আরেকটা 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' গত হয়ে গেল। বাংলাদেশে এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কিছু অংশ, বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ জেলায় নানানভাবে এই মাতৃভাষা দিবস পালন করা এখন সংবাৎসরিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উঠেছিল, এবারও কি এই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বাংলাদেশে অন্যান্যবারের মতো ধুমধাম করে পালিত হবে? মহম্মদ ইউনুসের তত্ত্বাবধায়ক সরকার কি তাঁদের দেশে মাতৃভাষা দিবস বা বাংলাভাষা দিবস যথাযথ মর্যাদায় পালন করতে দেবে? এটা অবশ্যই লাখ টাকার প্রশ্ন। অবশ্য আমরা জানি, এপার বঙ্গে, মুর্শিদাবাদ জেলায়, ডান-বাম নির্বিশেষে সবাই জাঁকজমক সহকারে এই দিনটি পালন করে থাকে। বাংলাদেশে এই দিনটি 'অমর একুশে' বলে পালন করা হয় নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। অবশ্য বাংলাদেশে এই দিনটি পালন করা নিয়ে আমার বিশেষ বক্তব্য নেই। কারণ বাংলাদেশে এখন যা চলছে, তা উৎকট আরবিয়ানা। কিন্তু এই প্রতিবেদক পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হওয়ায় এই লেখার অবতারণা। আমি অসন্দিগ্ধভাবে আমার মাতৃভাষা বাংলাকে ভালোবাসি। জীবনের নানা ক্ষেত্রে বাংলাভাষা প্রয়োগ করে থাকি।

কিন্তু 'অমর একুশে' আমার বলে মনে করতে পারি না। যাঁরা মনে করেন, ওপার বাংলা অর্থাৎ বাংলাদেশেই বাংলাভাষা টিকে থাকবে আমি কেন জানি না ঠিক তাদের দলের বলে নিজেকে মনে করতে পারি না। পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের ভাষাকে আমার পুরোপুরি বাংলাভাষা বলেই মনে হয় না। ওখানে প্রচলিত উর্দু— আরবি-ফারসি শব্দে অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত ওই ভাষাকে আমার বাংলাভাষা বলেই মনে হয় না। সুতরাং ওই ভাষাকে কেন্দ্র করে যে ভাষা আন্দোলন সেই আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করতে দ্বিধা হয়। আমি মনে করি, বাংলাভাষাকে বাঁচিয়ে রাখবে পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি, বাংলাদেশের বাঙ্গালিরা নয়। এখানে স্মর্তব্য যে, সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কেন্দ্রীয় সরকার অন্যান্য কয়েকটি ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষাকেও 'ধ্রুপদী' ভাষার মর্যাদা দিয়েছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বাংলাভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং তার প্রসারে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার যথেষ্ট উদ্যোগী হবে। অবশ্য এই উদ্যোগে রাজ্য সরকারকে যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। তবে, রাজ্য সরকার তো উর্দু মানসিকতায় আচ্ছন্ন।

**কলকাতার একটা বড়ো অংশে বাংলা ভাষার কোনো অস্তিত্বই নেই; সেখানে নানা নামফলকে উর্দু, ইংরেজি থাকলেও বাংলা নেই। রাজাবাজার, ৪৪নং ওয়ার্ড ইত্যাদি উর্দু, ইংরেজিতে রাস্তার নামফলক শোভা পাচ্ছে, কিন্তু তাতে বাংলার কোনো অস্তিত্বই নেই।**

এহ বাহ্য। মধ্য পশ্চিমবঙ্গে এই 'বাংলাদেশি বাংলাকে' নিয়ে ইদানীং একটা উন্মাদনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ বেশ হইচই করেই দিনটি পালন করেন; পিছিয়ে থাকে না বামেরাও। জেলার সালার অঞ্চলের আবুল বরকতকে নিয়ে বেশ উন্মাদনাই তৈরি হয়। অথচ, বাংলাভাষার প্রথম বলিদানী যদি কাউকে বলা যায় তাহলে তিনি অবশ্যই ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। অথচ ওই বঙ্গ তাঁকে ভুলে থাকতে চায়, আর এই বঙ্গ তাঁর কথা জানেই না। কিন্তু এই বিস্মৃতি কোনোভাবেই তাঁর প্রাপ্য নয়।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম অধুনা বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবেড়িয়া শহরের লাগোয়া রামরাইল গ্রামে, ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২ নভেম্বর। তিনি একাধারে ছিলেন ভাষাসংগ্রামী ও মুক্তিযোদ্ধা, আইনজীবী, সমাজকর্মী ও রাজনীতিবিদ। পেশাগত জীবনে তিনি ছিলেন শিক্ষক, কুমিল্লা জেলা বারের আইনজীবী। তাছাড়া ১৯১৫ সালের ভয়াবহ বন্যা এবং ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় বন্যার্ত ও দুর্ভিক্ষপীড়িতদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কুমিল্লার অভয় আশ্রমের কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন। কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ব্যারিস্টার আব্দুর রসুলের রাজনৈতিক মতাদর্শে আকৃষ্ট হয়ে তিনি ১৯০৫ ক্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ শহরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন। এমনকী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ডাকে তিনি

তিন মাসের জন্য আইন ব্যবসা স্থগিত রাখেন এবং অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪২ সালে তিনি আগস্ট আন্দোলন বা ভারত ছাড় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনেও তিনি কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরেই তিনি পাকিস্তানের সংবিধান রচনার জন্য পূর্ববঙ্গ থেকে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত বন।

পরবর্তীকালে তিনি পাকিস্তানের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালের জুন মাসে পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানে রাজ্যপালের শাসনের বিরোধিতা করে একটি 'ছাঁটাই' প্রস্তাব আনেন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৯৫৮ অবধি তিনি আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভায় পূর্ব পাকিস্তানের স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রকের দায়িত্ব পালন করেন।

কিন্তু এহ বাহ্য। এর আগেই একজন বাংলাভাষাপ্রেমিক হিসেবে তিনি পাকিস্তানে বাংলাভাষার স্বাধিকার রক্ষা এবং তার গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকার জন্য তিনি উল্লেখযোগ্য ভুমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালের ২৩ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি করাচীতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে তিনি ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলাভাষাকেও পাকিস্তানের সরকারি ভাষা করার দাবি উত্থাপন করেন। অধিবেশনের শুরুতে আলোচনার সূত্রপাত করে তিনি বলেন : Mr. President, Sir, I move, 'That in sub-rule (1) of rule 29, after the word 'English' in line 2, the words 'or Bengalee' be inserted.' গণপরিষদের সভায় তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল, 'দেশের ছয় কোটি নব্বই লক্ষ নাগরিকদের মধ্যে চার কোটি চল্লিশ লক্ষ মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলেন। তাহলে আপনিই বলুন, সরকারি ভাষা কি হওয়া উচিত? একটা দেশের সরকারি ভাষা তো সেই ভাষাই হওয়া উচিত, যাতে বেশিরভাগ মানুষ কথা বলেন।' তাঁর এই কথার সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন মাত্র তিনজন প্রতিনিধি এবং তাঁরা সকলেই হিন্দু। তাঁরা বলেন প্রেমহরি বর্মণ, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ও শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কংগ্রেসের রাজকুমার চক্রবর্তীও বলেন, 'উর্দু পাকিস্তানের পাঁচ প্রদেশের কোনোটিরই কথ্য ভাষা নয়। বাংলাকে আমরা দুই অংশের সাধারণ ভাষা করার জন্য চাপ দিচ্ছি না। শুধু চাই 'সরকারি ভাষা' হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি।' বলা বাহুল্য, তাঁর এই প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পায়নি। পাকিস্তান সংসদে তাঁর এই প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করে প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও প্রয়াত জাতীয় গবেষণা অধ্যাপক জয়ন্তকুমার রায় তাঁর Democracy and Nationalism on Trial– A study of East Pakistan গ্রন্থে লিখেছেন, On 25 February 1948, Mr. Dhirendra Nath Datta, a Hindu member of Pakistan's Constituent Assembly, demanded that Bengal should be used, alongwith Urdu, in the proceedings of the Assembly. Prime Minister Liaquat angrily retorted that Urdu alone could be the national language of a Muslim state such as Pakistan. এখানে উল্লেখ্য যে, এমনকী পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান সদস্যরাও কিন্তু বাংলাভাষার পক্ষে এগিয়ে আসেনি তখন। পঞ্জাবী ও উর্দুভাষাপন্থীরা কোনো ভাবেই এই দাবি মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খাঁ ভাষার সঙ্গে ধর্ম, জাতীয় ঐক্য ইত্যাদি জুড়ে দিয়ে বলেন, 'উপমহাদেশের কোটি কোটি মুসলমানের দাবিতে পাকিস্তানের জন্ম এবং তাঁদের ভাষা উর্দু। কাজেই বেশিরভাগ জনগণ যে ভাষায় কথা বলেন, তাঁকে প্রাধান্য দিতে যাওয়া ভুল হবে।

'১১ মার্চ গণপরিষদে' রাষ্ট্রভাষা উর্দু' এই মর্মে বিল পাশ হয়। আর তাঁরা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও অন্যান্যদের প্রস্তাবকে বাঙ্গালিদের ষড়যন্ত্র বলেই মনে করে। ফলে ধীরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে শুরু হয় ষড়যন্ত্র। কিন্তু কোনোভাবেই তাঁকে থামিয়ে রাখতে পারেনি উর্দুপন্থীরা। পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ধীরেন্দ্রনাথের বক্তব্য থেকেই। বাস্তবিক অর্থেই ধীরেন্দ্রনাথ দত্তই ছিলেন পূর্ব-পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) ভাষা আন্দোলনের জনক। গণপরিষদের অধিবেশনে যাওয়ার আগে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরেছিলেন; মানুষের মনের কথা জেনেছিলেন। ভাষা হারালে একটা জাতি হারিয়ে যাবে, এটা তিনি অনুভব করেছিলেন। তিনি এটাও অনুভব করেছিলেন যে, একটা দেশের ভাষা ও সংস্কৃতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত; ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেই দেশের হিন্দু বাঙ্গালিরাও। ধীরেন্দ্রনাথের বক্তব্যই বাংলা ভাষা আন্দোলনকে একটা সাংগঠনিক রূপ দিয়েছিল। অবশেষে এল ১৯৫২ সালের সেই ভাষা আন্দোলনের দিন, একুশে ফেব্রুয়ারি। সারা পৃথিবী দেখল, মাতৃভাষার প্রতি টান মানুষের মধ্যেকার ভেদাভেদ ভুলিয়ে প্রাণ দিতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। পুলিশের অত্যাচার যত বাড়ল, আন্দোলনও তত তীব্র হলো। ধীরেন্দ্রনাথও আরও সবাক হলেন, হলেন আরও সক্রিয়। কিন্তু যে বাংলা ভাষার জন্য তিনি দাবি তুলেছিলেন, সেই বাংলা ভাষা পশ্চিমবঙ্গেরও বাংলা ভাষা; সেই বাংলা ভাষা বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ- বঙ্কিমচন্দ্রেরও ভাষা। সেই ভাষা উর্দু-আরবি-ফারসি শব্দবহুল বাংলা নয়।

পাকিস্তানি স্বৈরাচারী শাসকের হাতে বারবার নির্যাতিত হতে হয়েছে বাংলাভাষার প্রথম ভাষা দৈনিক ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে। ১৯৬৫-তে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় তাঁকে গৃহবন্দি করে রেখেছিল পাক সরকার। আবার ১৯৭১-এর ২৯ মার্চ তাঁর ছোটো ছেলে দিলীপকুমার দত্ত ও তাঁকে কুমিল্লার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে কুমিল্লা সেনা ছাউনিতে নিয়ে যাওয়া হয়; সেখানে অকথ্য নির্যাতনের পরে সকলের অজান্তে তাঁদের হত্যা করা হয় ১৪ এপ্রিল। এইভাবে বাংলা ভাষার প্রথম ভাষাসৈনিকের অসাধারণ জীবন শেষ হয়ে যায়। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক পটপরিবর্তন ধীরেন্দ্রনাথের সেই ভাষা আন্দোলনকে নস্যাৎ করে দিয়েছে; সেখানে আবার উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও উর্দুভাষার উচ্চকিত পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এই সময়ে, এমনকী পশ্চিমবঙ্গেও বাংলাভাষার উপর নেমে এসেছে একদিকে উর্দু, আর অন্যদিকে ইংরেজির আগ্রাসন। কলকাতার একটা বড়ো অংশে বাংলা ভাষার কোনো অস্তিত্বই নেই; সেখানে নানা নামফলকে উর্দু, ইংরেজি থাকলেও বাংলা নেই। রাজাবাজার, ৪৪নং ওয়ার্ড ইত্যাদি উর্দু, ইংরেজিতে রাস্তার নামফলক শোভা পাচ্ছে, কিন্তু তাতে বাংলার কোনো অস্তিত্বই নেই। আজকের দিনে তাই ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের মতো বিস্মৃত ভাষাপ্রেমিককে আরও বেশি করে স্মরণ করা প্রয়োজন। স্মরণীয় কল্পনা ভট্টাচার্য-সমেত শিলচরের সেই একুশজন ভাষসৈনিকও।

*(একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)*

# মহাকুম্ভ ধর্মীয় ঐতিহ্য ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনার অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ

**ধর্মানন্দ দেব**

গত ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রায় এক বছরের ব্যবধানে ২০২৫ সালের ১৩ জানুয়ারি প্রয়াগরাজে শুরু হয় ১৪৪ বছর পর পূর্ণমহাকুম্ভ। মহাকুম্ভে মেতেছে গোটা দেশ। বলা ভালো গোটা বিশ্ব। আপাতত গোটা বিশ্বের ঠিকানা এখন প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ। অনেকে একে দৈব পিকনিকও বলছেন। ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই মহা ইভেন্ট চলবে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। মহাকুম্ভ মেলা শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি একটি বৃহৎ অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় ইভেন্ট হিসেবেও স্বীকৃত। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি এটি দেশের অর্থনীতির জন্য এক বিশাল গতি আনার সুযোগ সৃষ্টি করছে। সারা দেশ থেকে আসা তীর্থযাত্রী, ব্যবসায়ী, পর্যটক ও কর্মীদের মেলবন্ধনে একটি অদ্ভুত আধ্যাত্মিক ও অর্থনৈতিক সংমিশ্রণ তৈরি হয়েছে। ২০২৫ সালের মহাকুম্ভ মেলা কেবল একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, বরং একটি বৃহৎ আর্থিক ঘটনাও, যা দেশের বিভিন্ন খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সৃষ্টি করছে।

প্রথমত, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মহাকুম্ভ ২০২৫-এর প্রস্তুতির জন্য প্রায় ৭,৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করার বাজেট রেখেছিল, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় অনেক বেশি বলা যায়। উত্তরপ্রদেশে সরকার ২০২৪-'২৫ অর্থবছরের জন্য ২,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। তবে সামগ্রিকভাবে, মহাকুম্ভের জন্য পরিকল্পিত বাজেট বৃদ্ধি দেখাচ্ছে যে, এই ইভেন্ট শুধু সরকারি আয় নয়, বরং দেশের স্থানীয় এবং জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। অর্থাৎ, এটি সরকারের আয় বৃদ্ধি ছাড়াও দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিশাল সুযোগ তৈরি করছে। চার হাজার হেক্টর জুড়ে গড়ে ওঠা কুম্ভমেলা এলাকায় ৪৫ দিন ধরে প্রায় চল্লিশ কোটির বেশি মানুষের আনাগোনা হবে। এই বিশাল পরিসরে বিভিন্ন ধরনের হোর্ডিং, ফ্লেক্স, এলইডি, অডিয়ো ভিস্যুয়াল প্যাকেজের জন্য রাজ্য সরকারকে মোটা অঙ্কের টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে। সিআইআই (কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি) এবং কনফেডারেশন অব অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্সের উত্তরপ্রদেশ শাখা সম্প্রতি একটি সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করে জানিয়েছে যে, দেড় মাসব্যাপী এই কুম্ভমেলায় অন্তত কয়েক লক্ষ কোটি টাকার বাণিজ্য হতে চলেছে। এর মানে, কুম্ভমেলা আর শুধুমাত্র ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি এখন একটি বড়ো ধরনের বিজনেস সামিটও হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ এটি একই সঙ্গে ধর্মীয় উৎসব এবং বাণিজ্যিক সম্মেলন।

২০১৯ সালের কুম্ভমেলা থেকে ১.২ লক্ষ কোটি টাকা আয় হয়েছিল, যা তখনকার সময়ের একটি রেকর্ড ছিল। ওই সময় কুম্ভমেলা যে আকার ধারণ করেছিল তা শুধু ধর্মীয় দিক থেকে নয়, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চাকরি সৃষ্টি সম্পর্কিত দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেই সময় মেলা প্রায় ৬ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছিল। এবার ২০২৫ সালে মহাকুম্ভমেলা আরও বড়ো আকারে আয়োজিত হচ্ছে এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ও কর্মসংস্থানও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মেলা কেবল ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং বৃহৎ এক অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জানিয়েছিলেন, ২০১৯ সালে প্রয়াগরাজে যে অর্ধকুম্ভমেলা হয়েছিল, তার ফলে রাজ্যের রোজগার হয়েছিল প্রায় ১.২ লক্ষ কোটি টাকা। সেবারের সেই আয়োজনের অংশ নিয়েছিলেন প্রায় ২৪ কোটি ভক্ত ও দর্শনার্থী। এই পরিসংখ্যানটি বিশ্লেষণ করলে, কুম্ভমেলার বাণিজ্যিক প্রভাব এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এই বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের পরিসংখ্যান অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। কনফেডেরেশন অব অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্সের এক রিপোর্ট অনুযায়ী, মহাকুম্ভমেলায় ২০২৫-এর মাধ্যমে সারা দেশের বিভিন্ন খাতে প্রায় ২ লক্ষ কোটি থেকে ৩ লক্ষ কোটি আর্থিক লেন-দেন হতে পারে। এর ফলে সারা দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য গতি আসবে। এর মধ্যে হোটেল, অতিথিশালা এবং অস্থায়ী আবাসন ব্যবস্থা প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা করতে সক্ষম হবে। খাদ্যপণ্য, পানীয়, বিস্কুট, জুস এবং অন্যান্য খাবারের বিক্রি প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার আশেপাশে পৌঁছাতে পারে।

ধর্মীয় সামগ্রী ও উপহারের বিক্রিতেও বিপুল পরিমাণ আয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। গঙ্গাজল, প্রদীপ, তেল, মূর্তি, ধূপকাঠি এবং ধর্মীয়

বইয়ের বিক্রি প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার হতে পারে। এই সামগ্রীর চাহিদা মেটাতে ব্যাপক আয়ের সুযোগ তৈরি হবে এবং এটি স্থানীয় শিল্প এবং সরবরাহ চেনের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবহণ ও লজিস্টিক্স খাতেও বিপুল আয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। কুম্ভমেলা এলাকা থেকে তীর্থযাত্রীদের স্থানান্তর এবং অন্যান্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা করতে পারে। স্থানীয় ও আন্তরাজ্য পরিবহণ, ট্যাক্সি, মাল পরিবহণ-সহ অন্যান্য লজিস্টিক্স সেবা থেকে এই বিপুল আয়ের উৎস সৃষ্টি হবে। এই আয়ের ধারা দেশের স্থানীয় ব্যবসায়িক পরিবেশকেও শক্তিশালী করবে।

স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রেও মহাকুম্ভমেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অস্থায়ী মেডিক্যাল ক্যাম্প, আয়ুর্বেদিক পণ্য এবং অন্যান্য চিকিৎসা সেবার মাধ্যমে সেক্টরটি ৩ হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি ব্যবসা করতে পারে। তীর্থযাত্রীরা ধর্মীয় অনুষ্ঠান শেষে নিজেদের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন, ফলে এই পরিষেবাগুলির চাহিদা অত্যন্ত বাড়বে। স্বাস্থ্যসেবা খাতে এমন বিশাল বৃদ্ধি স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং পণ্য সরবরাহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

আইটি এবং ডিজিটাল পরিষেবাগুলিও মহাকুম্ভমেলা থেকে বড়ো আয়ের উৎস হতে পারে। ডিজিটাল টিকিটিং, পেমেন্ট ব্যবস্থা, ওয়াই-ফাই পরিষেবা এবং মোবাইল চার্জিং স্টেশনগুলির চাহিদা বাড়বে। এই পরিষেবাগুলির মাধ্যমে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হতে পারে। এসব প্রযুক্তিগত সুবিধা ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন জেনারেশনের একাধিক ডিজিটাল উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হবে।

বিনোদন ও মিডিয়া সম্পর্কিত ব্যবসাগুলিও বিশাল আকার ধারণ করবে। মিডিয়া, বিজ্ঞাপন এবং প্রচারণামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে এই ইভেন্ট থেকে ১০ হাজার কোটি টাকার বাণিজ্যিক লাভ হতে পারে। এছাড়া, মেলার পুণ্যার্থীদের আকর্ষণের জন্য বিনোদন এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে আর্থিক প্রবাহ বাড়বে।

এছাড়া, মহাকুম্ভমেলা স্থানে প্রায় ১৫০টি হোটেল এবং অতিথিশালা রয়েছে, যা পুণ্যার্থী এবং পর্যটকদের স্বাগত জানাচ্ছে। বিলাসবহুল তাঁবুগুলির দাম প্রতি রাতে ১৮ হাজার থেকে ২০ হাজার এবং প্রিমিয়াম আবাসনগুলির দাম ১ লক্ষ পর্যন্ত। বিশেষ দিনগুলোতে বিলাসবহুল তাঁবুগুলির চাহিদা অনেক বেড়ে যায়, যা আবাসন খাতে আরও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

সংবাদ সংস্থা আইএনএস-এর হিসেব অনুসারে, যদি মহাকুম্ভে আসা পুণ্যার্থী ও ভক্তরা তাঁদের একজনের গড় খরচ ৫ হাজার টাকা বাড়িয়ে ১০ হাজার টাকা করেন, তাহলেই উত্তরপ্রদেশ সরকারের আয় এক লাফে বেড়ে দ্বিগুণ— প্রায় ৪ লক্ষ কোটি টাকা হবে! এটি ভারতীয় অর্থনীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে এবং দেশের জিডিপি বাড়ানোর বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

এছাড়া, এক টিভি চ্যানেলের রিপোর্ট অনুযায়ী মহাকুম্ভমেলা উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ বিজনেস আইডিয়া সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে উঠেছে। এক বিক্রেতা, যিনি ১ টাকায় নিমের দাঁতন বিক্রি করছেন, বলছেন যে এই ব্যবসার মাধ্যমে ৪০ কোটি টাকার আয়ের পরিকল্পনা করছেন তিনি। ওই ভিডিয়োতে বলতে শোনা যাচ্ছে, সেই ব্যক্তিটি ১ টাকায় নিমের দাঁতন বিক্রি করছেন। আর ভিডিয়োতেই দর্শকদের উদ্দেশে তিনি বলেন যে কীভাবে এর মাধ্যমে ৪০ কোটি টাকা রোজগার করতে পারেন তিনি। এছাড়াও ব্যবসার জন্য এই নিমের দাঁতনে কোনো ইনপুট কস্ট বা পুঁজি লাগছে না। নিম গাছ খুঁজে ডাল পেড়ে আনলেই হয়ে যাবে ব্যবসার রসদ জোগাড়।

২০২৫ সালের মহাকুম্ভমেলা থেকে উত্তরপ্রদেশ সরকারের ২ লক্ষ কোটি টাকা পর্যন্ত লাভ হতে পারে। অনুমান অনুসারে, ৪০ কোটি দর্শনার্থীর প্রত্যেকে যদি গড়েই ৫ হাজার টাকা ব্যয় করে, করতে পারেন বলেও মনে করা হচ্ছে, তাহলে সরকারের আয়ের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াতে পারে ৪ লক্ষ কোটি টাকা পর্যন্ত। মহাকুম্ভমেলার পর দেশের জিডিপিও ১ শতাংশ বাড়তে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

এবারের ৪৪ দিনের মহাকুম্ভমেলা অন্তত ছ'টি অমৃত স্নানের দিন রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌনী অমাবস্যার অমৃতস্নান। এই ছয় স্নানের দিন প্রয়াগরাজে সবচেয়ে বেশি ভিড়। এবার পুণ্যার্থীদের থাকার জন্য মেলাপ্রাঙ্গণে প্রায় দেড় লক্ষ তাঁবু পাতা হয়েছে। রয়েছে তিন হাজার রান্নার জায়গা, ১ লক্ষ ৪৫ হাজার বিশ্রামাগার এবং গাড়ি রাখার ৯৯টি জায়গা ৪০ হাজারের বেশি পুলিশ থাকছে নিরাপত্তার দায়িত্বে। ১৪৪ বছর পর আবার ২০২৫ সালে দেখা মিলল মহাকুম্ভের। গবেষকদের অনুমান অনুযায়ী আমেরিকা ও রাশিয়ার মতো দেশের জনসংখ্যার চেয়ে বেশি জমায়েত হতে পারে এই উত্তরপ্রদেশের প্রয়োগরাজের মহাকুম্ভমেলায়। এই মেলায় দেশ-বিদেশের বহু পুণ্যার্থী ভিড় জমাচ্ছেন।

হিন্দুশাস্ত্র অনুয়ায়ী, প্রত্যেক ১৪৪ বছর পর আসে পূর্ণমহাকুম্ভ এবং তার মধ্যে ৪ বছরে হয় কুম্ভমেলা, ৬ বছরে অর্ধ কুম্ভমেলা এবং ১২ বছরে পূর্ণকুম্ভমেলা। অর্থাৎ এর থেকে বোঝা যায় এই ১৪৪ বছরের মহাকুম্ভমেলার সংযোগ হলো অতি বিরল এবং কুম্ভমেলায় উপস্থিত থাকা অনেক সাধুসন্তদের মতে ২০২৫ সালের এই মহাকুম্ভমেলার পবিত্র তিথি আর কোনোদিনও দেখা মিলবে না!

বিশ্ববাসীর পাশাপাশি ভারতবাসীর কাছে সবচেয়ে বড়ো আশ্চর্যের বিষয় হলো এই মহাকুম্ভের মেলায় স্টিভ জোবসের স্ত্রীকেও যুক্ত হতে দেখা যায় সম্পূর্ণ গেরুয়া পোশাকে। শুধু তাই নয় তাঁকে ত্রিবেণী সঙ্গমে ডুব দিতেও দেখা গিয়েছে। পাশাপাশি কুম্ভমেলার শুরুতে অর্থাৎ পূর্ণিমার দিন সেই পবিত্র তিথিতে তিনি সনাতন ধর্ম গ্রহণ করেন। সেইসঙ্গে তার নাম লরিন পাওয়েল থেকে কমলায় পরিবর্তিত হয়।

মহাকুম্ভমেলা শুধু এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং এটি একটি বিশাল অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইভেন্টে আজ পরিণত হয়েছে। এর আধ্যাত্মিক এবং বাণিজ্যিক উভয় দিকেই দেশের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই মহাকুম্ভমেলা ভারতের উন্নয়ন এবং বৈশ্বিক স্তরে তার অবস্থান শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পরিশেষে বলা যায়, এক বছরের ব্যবধানে উত্তরপ্রদেশে দুটি মেগা ইভেন্টের আয়োজন করা রাজ্য সরকারের পক্ষে চাট্টিখানি কথা নয়। তবুও হিন্দুত্বের প্রতিভূ যোগী আদিত্যনাথ অযোধ্যা সামলেছেন। এবার মহাকুম্ভমেলায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে পারেন কি না সেটাই দেখার। যদি পারেন তবে মোদীজীর উত্তরসূরি তিনিই, তাঁর মতো দক্ষ নেতৃত্ব ভারতে আর কে দিতে পারেন?

*(লেখক পেশায় আইনজীবী)*

# মহাকুম্ভমেলায় আমার চোখে এক টুকরো ভারত

**কুমারেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার**

আমি মহাকুম্ভমেলায় যাওয়ার আগে প্রত্যেকে নেতিবাচক রিভিউ দিয়েছিল ভয় দেখিয়েছিল কোনো জানা অজানা কারণে। তাই আমি যা দেখলাম, উপলব্ধি করলাম সেটাই হুবহু লিখলাম। ফেরার পথে ট্রেনে বসে।

কতো মানুষ দেখলাম একসঙ্গে হাঁটছে ৮ থেকে ৮০। কোনো ক্লান্তি নেই। কোনো জাতি নেই। সবাই একই জলে স্নান করছে। কোনো আবাহন নেই, কোনো বিসর্জন নেই। আসছেও, চলেও যাচ্ছে। কেউ ডাকেনি কেউ যেতেও বলেনি। সম্পূর্ণ মেলা এলাকায়, শহরে সারাদিন ভাণ্ডারা চলেছে। তাই কেউ অভুক্তও নেই। আমরা শুধু সেবা গ্রহণ করিনি সেবা দিয়েছিও। কেবল আর্থিক নয় শারীরিক শ্রমের মাধ্যমে সেবাও করার চেষ্টাও করেছি। বুঝলাম ধর্মপথ শুধু পাপ হরণ করে না, ক্ষিদে, বৈষম্য, হানাহানি, মায়েদের প্রতি বিদ্বেষ, লোলুপতা কিছুই থাকবে না। যে ভারতবর্ষ আমাদের একসময় ছিল।

কুম্ভমেলায় যাবার জন্য তিনটি স্টেশন আছে। রামবাগ সবচেয়ে কাছের স্টেশন দূরত্ব মোটামুটি কম বেশি ৪ কিলোমিটার। বাকিগুলো ১০-১২ কিলোমিটার। ত্রিবেণী সঙ্গম হলো ৩ তিন নম্বর সেক্টরে। মোট চব্বিশটা সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে পুরো জায়গাটাকে। ৪০ হাজার হেক্টর জায়গা নিয়ে এবারের কুম্ভমেলা আয়োজিত হচ্ছে। যমুনা নদীর উপর ত্রিশটা ভাসমান অস্থায়ী সেতু নির্মিত হয়েছে।

সড়ক পথে সাতটা পয়েন্ট দিয়ে কুম্ভ মেলায় প্রবেশ করা যায়। প্রবেশ করার আগেই গাড়ি পার্কিঙের ব্যবস্থা আছে। আকাশপথে এবং জলে সবসময় ড্রোন দিয়ে নজরদারি চালানো হচ্ছে। পুলিশ আধা সামরিক বাহিনী এবং অন্যান্য নিরাপত্তা রক্ষীরা সবসময় সজাগ এবং সতর্ক হয়ে আছে। যারা মনে মনে যাবার ইচ্ছা পোষণ করছেন, তাদেরকে বলব লোটা কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন এমন জিনিস ভূ-ভারতে আর কোনোদিন দেখতে পাবেন না।

ট্রেনে টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না বললেই চলে। আমরা ২ মাস আগেই টিকিট করে রেখেছিলাম। ব্রহ্মপুত্র মেল-এ মালদা থেকে প্রয়াগরাজ। তবুও সমস্ত কামরাতেই লোক উঠে যাচ্ছে, থ্রি এসিতেও উঠেছিল যেখানে আমরা ছিলাম। তবে তাতে কোনো অসুবিধে হবে না সবাই মিলেমিশে পৌঁছে যাবেন গন্তব্যে। কারণ সবাই তীর্থযাত্রী, তাই সবাই খুব সহযোগী। তবে হাঁটার মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই যাবেন। নো ভেহিকেল জোন করা আছে প্রয়াগরাজে। কোনো ধাক্কা ধাক্কি নেই। যে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করলে স্থানীয় পুলিশকে জিজ্ঞাসা করাই ভালো, সেনা বাইরে থেকে আসে তাই গাইড করতে পারবে না হয়তো। কোনো ফেসবুক পোস্ট বা রিল দেখে প্রভাবিত হবেন না। মৌনী অমাবস্যায় একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে ঠিকই। কিন্তু পরিস্থিতি অতি সত্বর স্বাভাবিকও করে দিয়েছে প্রশাসন। আসল বিষয় হলো মৌনী অমাবস্যার দিন সঙ্গম ঘাটে অর্থাৎ যাকে আমরা সঙ্গম নোস বলছি সেটা মোট ২ কিমির ঘাট আর অতটুকু জায়গায় প্রায় কয়েক কোটি মানুষ পৌঁছে গেছিল। তাতেই অঘটন। অমাবস্যার একই ছবি হাজার বার পোস্ট করে অপপ্রচার করে এক শ্রেণীর মিডিয়া বদনাম করছে, কান দেবেন না। যারা কলকাতায় ৫০ হাজার ভিড় হলে পূজা বন্ধ করে দেয়। তারাই এসব করছে। সঙ্গে কমিউনিস্ট দোসর। দুর্ঘটনারদিন শোনা যাচ্ছে কোনো চক্রান্ত ছিল। অপেক্ষা করুন, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর পর্যবেক্ষণে তদন্ত হচ্ছে। সত্যি বেরিয়ে এলে পশ্চিমবঙ্গে খেলা হয় এখানে রীতিমতো শিক্ষা হবে। সব নোংরামো বন্ধ হয়ে যাবে। কাল আমরা যখন স্নানে যাচ্ছিলাম তখন কয়েকজন চক্রান্তকারী ধরাও পড়েছে।

এরপর পরিস্থিতি যথেষ্ট স্বাভাবিক রয়েছে। পুলিশ অসম্ভব পরিশ্রম করছে, সাহায্য করছে অতুলনীয়। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের মতো হপ্তাবাজি, গুণ্ডাগিরি ছাড়ুন, সারাদিন ডিউটি করে চোখে মুখে বিরক্তির লেশ মাত্র নেই। আমরা একটা টোটোতে যাচ্ছিলাম, রাস্তায় পুলিশ টোটো দাঁড় করিয়ে ড্রাইভারকে এবং আমাদের জিজ্ঞাসা করলো ভাড়া কতো নিচ্ছে। বেশি যেন না দিই সচেতন করে দিল। আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী পুলিশ মানে গুণ্ডা বলেই জানি। এরা তো দেবদূত। সারা শহর, মেলা পুলিশে ছয়লাপ দেখে সুরক্ষিত অনুভব হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের মতো ভয় হচ্ছে না। তাই ইউপি পুলিশের প্রতি ভালোবাসা রইলো। তবে এসবই সম্ভব হয়েছে নেতৃত্বের গুণে। তাই যোগীজীকে প্রণাম। নইলে এই পুলিশই রেপিস্টদের সুরক্ষা দিত মুলায়ম, অখিলেশের সময়। যাইহোক, ভিড় থাকলেও ফাঁকা ফাঁকাতেই আরামে হাঁটতে পারবেন। কুম্ভমেলায় দেড় লক্ষ শৌচালয় নির্মিত হয়েছে। স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য সাড়ে চার লক্ষ সাফাই কর্মচারী, এ কাজের ম্যানেজমেন্টে বারো হাজার লোক, তাদের ওপর আরও এক হাজার টপ ম্যানেজমেন্টের লোক নিযুক্ত করা হয়েছে। মোট চার লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার কর্মচারীদের সপরিবার মেলার দেড় মাস থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাদের বাচ্চাদের জন্য অস্থায়ী বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে। যাতে করে তাদের পড়াশোনা নষ্ট না হয়। প্রায় পনেরো লক্ষ বিদেশি ভক্ত আসার

কথা, তাদের জন্য বিভিন্ন রকম ট্যুর প্রোগ্রাম করা হয়েছে, যাতে তারা ভারতবর্ষকে জানার সুযোগ পায়। তাদের জন্য পঞ্চাশটি উচ্চ মানের লাক্সারি টেন্ট লাগানো হয়েছে। বসন্ত পঞ্চমীর পবিত্র অমৃতস্নান উপলক্ষ্যে বিশ্বের ৭৭টি দেশের ১১৮ জন কূটনীতিক তাঁদের পরিবার-সহ মহাকুম্ভ পরিদর্শন করলেন এবং স্নান করলেন। এছাড়াও বিভিন্ন দিন দেশ বিদেশের অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, রাষ্ট্রপ্রধান ইতিমধ্যে অংশ হয়েছেন বিশ্বের সর্ববৃহৎ শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় জমায়েত। যেন বসুধৈব কুটুম্বকমকেই সত্যি প্রমাণ করছে। একমাত্র ভারতীয় ধর্ম পরম্পরার এই বিশিষ্টতা হয়েছে যেখানে সকল মত ও পন্থের অনুসারীগণ সরস্পরের মতো ও পন্থের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং ধর্মকাজে পরস্পরের প্রতিযোগী নয়, সহভাগী।

বাংলায় একটি প্রবাদবাক্য আছে 'কুম্ভমেলায় হারিয়ে যাওয়া ভাই বোন খুঁজে পাওয়া'... এবার কুম্ভমেলায় ২৭ হাজার সিসিটিভি ক্যামেরা আছে এ-১ টেকনোলজি পাওয়ার্ড, কেউ হারিয়ে গেলে খুঁজতে ৫ মিনিট ও লাগবে না, সব কিছু রিয়েল টাইম মনিটরিং হচ্ছে।

কুম্ভমেলায় সরকারি তরফে খরচ হয়েছে ১৫ হাজার কোটি, যার মধ্যে ১২ হাজার কোটির ইনফ্রাস্ট্রাকচার পার্মানেন্ট (এরমধ্য পার্মানেন্ট স্টেহাউস এবং রোজ ওয়েজও আছে)। সরকারি আয় হতে চলেছে ২-৩ লক্ষ কোটি, বেশিও হতে পারে কারণ কুম্ভমেলার পুণ্যার্থীদের একটা বড়ো অংশ রামমন্দির দর্শনে অযোধ্যাও যাচ্ছে। এটা শুধু উত্তরপ্রদেশের অর্থনীতির উন্নয়নতো বটেই দেশের জিডিপি-কেও ১ শতাংশের উপরে বুস্ট করবে। হার্ভার্ডের চারজন প্রফেসর নিজেরা উপস্থিত থেকে রেকর্ড করছেন সব কিছু, হার্ভার্ডে স্কুল অব ইকোনমিক্সে পড়ানো হবে এই বিজনেস মডেল।

সেরকমই রেলওয়ের ব্যবস্থা। মোট ৪৭টি কুম্ভ স্পেশাল ট্রেন দেওয়া হয়েছে, যেগুলি দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রয়াগরাজ পৌঁছচ্ছে। প্রয়াগরাজ শহরে মোট সাতটি স্টেশন আছে। যেদিন বেশি ভীড় হচ্ছে কিছু রেগুলার ট্রেন-কে ডাইভার্ট করে প্রয়াগরাজ জংশনের পরিবর্তে অন্য অন্য স্টেশনে ঢোকাচ্ছে। তাতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। আপনি যেখানেই যান, হাঁটতে আপনাকে হবেই। ভীড় কম থাকলে টোটো অ্যালাও করছে নইলে কিছুদূর গিয়ে নামিয়ে দিচ্ছে। তবে বেশ কিছু বাইক ঘুরে বেড়াচ্ছে, সার্ভিস দিচ্ছে। ওরা অ্যালাওড্। কিন্তু রেন্ট অনেক চাইছে। স্টেশনেও মোট ১৮টি ডিপার্টমেন্ট কাজ করছে। সকলেই প্রচণ্ড সহযোগিতা করছে।

# আমার দেখা মহাকুম্ভমেলা

**নিত্যানন্দ দত্ত**

গত ২৭ জানুয়ারি বাসে করে সপরিবার প্রয়াগরাজে কুম্ভমেলায় রওনা হই। বাস ঠিকমতো পৌঁছতে না পারায়, মৌনী অমাবস্যায় স্নান করা হয়নি। পরদিন কানাইয়া পার্কে বাস রেখে হেঁটে রওনা হই। মোট ৭টি পয়েন্টে বাসের পার্কিঙের ব্যবস্থা ছিল, আমাদের পার্কিঙের স্থানটি সুন্দরভাবে সাজানো, সুন্দর জলের ব্যবস্থা, পায়খানা, বাথরুম সারিবদ্ধ ভাবে থাকায় আমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি। রাস্তার দুইধারে বিভিন্ন সাধু সন্ন্যাসীদের আখড়া, কি সুন্দর স্বচ্ছ রাস্তা, কীভাবে ১৫ কিলোমিটার একসঙ্গে হেঁটে নদীর ধারে প্রথম সেক্টরে পৌঁছলাম তা ভাবা যায়নি। মোট ২৪টি সেক্টরে স্নান করার জন্য ভাগ করা হয়েছে যাতে সবাই একসঙ্গে স্নান করতে পারে, আমরা যাদের বয়স বেশি তারা রিক্স না নিয়ে ১নং সেক্টরে স্নান করতে গেলাম, যাদের বয়স কম তারা সবাই ৩নং সেক্টরে অর্থাৎ ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করতে গেল, তার আগের দিন মৌনী অমাবস্যার দিন কিছু অঘটন ঘটেছিল যদিও মিডিয়া অনেক বাড়িয়ে বলছে, আমরা ঠিক ভোর চারটায় স্নান করতে যাচ্ছে।

সারা ভারতবর্ষের সব প্রান্তের মানুষ সামিল হচ্ছে, সেখানে ধনী দরিদ্রের জাত পাতের কোনো ভেদাভেদ নেই, প্রাচীনকালের আর্য্যমুনি ঋষি কণ্ঠে উদাত্ত বাণী— ওঁ শ্রী প্রয়াগরাজে মকরস্থ রবৌ মাঘে গোবিন্দাচ্যুত মাধব। স্নানেনানেন মে দেব যথোক্তফলদো ভব। ওঁ শ্রীশ্রী জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং। ধ্বান্তারিং সর্ব পাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্।। —আমরাও সন্ন্যাসীদের কণ্ঠে গলা মিলিয়ে একসঙ্গে ত্রিবেণীতে অবগাহন করলাম। মেলার নিরাপত্তায় পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী সব সময় সজাগ, আকাশপথে ও জলে ড্রোন দিয়ে নজরদারি, নদীরতীরে ত্রিশটি ভাসমান সেতু। মেলায় স্বচ্ছতা চোখে পড়ার মতো, স্বতঃস্ফূর্ত স্বেচ্ছাসেবকরা কাজে নিযুক্ত। খবর নিয়ে জানলাম, বিনা পারিশ্রমিকে তারা কাজ করে যাচ্ছেন, স্থানে-স্থানে কাঠ পুড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে হাত গরম করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন, মেলা প্রাঙ্গণে ভাণ্ডারার আয়োজন করে বিভিন্ন খাওয়ার তৈরি করে আমাদেরকে খাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন, আমরাও পেটভরে দেখলাম, আমরা কলকাতা থেকে অনুমতি পত্র নিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সেবাকেন্দ্রে গেলাম, সেখানে আগে থেকে আমাদের জন্য নগর ৫নং তাঁবুটি ব্যবস্থা ছিল ভোরবেলায় সঙ্ঘের প্রাতঃস্মরণ ও প্রার্থনা করলাম। সময় কম থাকায় কুম্ভমেলায় বেশি সময় থাকা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আনন্দে মন ভরে গিয়েছে।

সুতপা বসাক ভড়

# শারীরিক সক্রিয়তা রক্ষায় মহিলারা

বর্তমানে আমরা দেখতে পাই যে, আধুনিক জীবনের পরিভাষা প্রতিনিয়ত যেন পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রত্যক্ষ প্রভাব আমাদের জীবনে সুস্পষ্ট, তবে এর নেতিবাচক দিকটিকেও আমরা অস্বীকার করতে পারি না। প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারে আমাদের অনেক সুবিধা। যেমন— শ্রম, অর্থ, সময় ইত্যাদির সাশ্রয় হয়েছে, অপরদিকে প্রযুক্তি আমাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে অলস করে দিয়েছে। আমরা অনেকসময় প্রযুক্তির সীমারেখা আমাদের জীবনে স্থির করতে ভুলে যাই— তখন হয় অপব্যবহার, যেমন অপ্রয়োজনে যথেচ্ছভাবে আলো, পাখা, এসি, গাড়ি, মোবাইল, ট্যাবলেট, কম্পিউটার, টিভি ইত্যাদির ব্যবহার করে থাকি। ফলস্বরূপ, নিজেদের জীবনের ভারসাম্য নিজেরাই হারিয়ে ফেলি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে কোনো সমস্যার সূত্রপাত এখান থেকেই শুরু হয়। আবার নিজেদের নিষ্ক্রিয়তার সপক্ষে বেশ কিছু অযৌক্তিক কথাবার্তা বলতেও আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। শুধু তাই নয়, আমাদের পরিবার ও সমাজের মধ্যেও এই রকম ধারণা ছড়িয়ে দিতে থাকি।

সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় জানা গেছে, আমাদের দেশে ২০ কোটির বেশি সংখ্যক মানুষ খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত নন বা শারীরিকভাবে সক্রিয় নন এবং বিশেষ করে মহিলারা খুব কম ব্যায়াম করে থাকেন।

ওয়ার্ল্ড হেলথ্ অর্গানাইজেশন-এর মতে, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট শারীরিক ব্যায়াম বাঞ্ছনীয়। এর ফলে শারীরিক অসুস্থতা যেমন, হাইপারটেনশন, ব্লাডপ্রেশারের মতো সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। বালক-বালিকা ও কিশোর- কিশোরীদের প্রত্যেকদিন কমপক্ষে ৬০ মিনিট ব্যায়াম অথবা খেলাধুলা করা আবশ্যক। বাস্তবে আমরা দেখতে পাই, অধিকাংশ অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা তাদের ক্রমাগত পড়াশোনার জন্য চাপ দিতে থাকেন। সাধারণত পড়াশোনাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে, তারপর খেলাধুলা। অথচ শারীরিক সক্রিয়তা ও খেলাধুলা আমাদের মানসিক অবস্থার ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে, মনসংযোগ কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে।

প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে একজন অভিভাবকের বক্তব্য— আমার সন্তান খেলাধুলা করলে পড়াশোনার ক্ষতি হবে। আবার অনেকের মতে রোগা মানুষদের ব্যায়ামের প্রয়োজন নেই। অনেক পরিণত বয়সের মানুষ বলে থাকেন খেলাধুলা, ব্যায়াম— এগুলো কেবলমাত্র ছোটোদের জন্য। অনেকক্ষেত্রে মেয়েদের খেলাধুলা, ব্যায়ামকে নিরুৎসাহিত করা হয়ে থাকে। দেখা গেছে, শহরের মেয়েদের শারীরিক ব্যায়াম বা সক্রিয়তা গ্রামের মেয়েদের তুলনায় অনেক কম। কারণ শহরে পার্ক বা খোলা জায়গা তুলনামূলকভাবে কম। এছাড়া মেয়েদের নিরাপত্তার বিষয়টিও বিবেচনাধীন। এদিকে মহিলাদের দিনের বেশিরভাগ সময় কর্মক্ষেত্রে, ঘরের কাজে, পরিবারের ছোটোদের এবং বয়স্কদের দেখাশোনায় ব্যতীত হয়।

শারীরিক সক্রিয়তা বা ব্যায়ামের নিয়মিত অভ্যাস করলে মানুষের হৃদযন্ত্র সুস্থ থাকে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, অস্থি-মাংসপেশী সুগঠিত হয়। শরীরের থেকে আমরা যত বেশি কাজ নেব, ততই সুস্থ থাকব। তাসত্ত্বেও প্রযুক্তির ফলস্বরূপ বিভিন্ন যন্ত্রাদি, বিশেষ করে মোবাইল, টিভি ইত্যাদি আমাদের মন ও শরীর অলস ও দুর্বল করে দিচ্ছে। এই বিষয়ে আমাদের একটু সচেতন হওয়া প্রয়োজন। আমরা মহিলারা বাড়িতে কাজের লোকের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল না হয়ে, বাড়িঘর পরিষ্কারের কাজ একটু-আধটু করতেই পারি। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা, যানবাহনের পরিবর্তে পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতে পারি। হালকা কিছু যোগাসনের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ এবং সক্রিয় থাকতে পারি। নিয়মিত ব্যায়াম করলে শরীর-মন তো ভালো থাকেই, এছাড়া ওষুধপত্রের প্রয়োজনও কম হতে থাকে। প্রথমদিকে নিয়মিতভাবে দিনে দশমিনিট এবং অভ্যেস হলে দৈনিক তিরিশ থেকে ষাট মিনিট ব্যায়াম করা শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকা সকল বয়সের মানুষের জন্যই লাভপ্রদ ও স্বাস্থ্যকর। সুতরাং আমরা মহিলারা এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নেব, কারণ শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ নাগরিকরা হলেন দেশের সম্পদ। □

# ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধের উপায়

**ডাঃ প্রকাশ মল্লিক**

ফ্লু বা ইনফ্লুয়েঞ্জা যা অনেকগুলো রেসপিরেটরি ভাইরাসের মধ্যে একটা ভাইরাস যেটা আমাদের মধ্যে সর্দি-কাশির সংক্রমণ ঘটায়।

মাথাব্যথা, নাক দিয়ে জল ঝরা, কাশি এবং গায়ে, হাত-পায়ে ব্যথা— খুব চেনা সাধারণ কিছু উপসর্গ বলে মানুষ শুরুতেই ভেবে নেন ঠাণ্ডা লেগেছে। আসলে এগুলো সবই ইনফ্লুয়েঞ্জার উপসর্গ। সাধারণত আবহাওয়া পরিবর্তনের সময়ই হয়, ফলে অনেকেই গুরুত্ব দেন না। কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ফ্লু হতে পারে প্রাণঘাতী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু)-র রিপোর্ট বলছে, প্রতিবছর ছ' লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মানুষের মৃত্যু হয় ইনফ্লুয়েঞ্জায়। বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক, অন্তঃসত্ত্বারা ইনফ্লুয়েঞ্জায় বেশি আক্রান্ত হয়।

ইনফ্লুয়েঞ্জা খুবই ছোঁয়াচে। আক্রান্তের হাঁচি, কাশির ড্রপলেট থেকে এই ভাইরাস অন্যকে দ্রুত সংক্রমিত করতে পারে। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস রয়েছে এমন কিছু স্পর্শ করার মাধ্যমেও ছড়াতে পারে। এই ভাইরাস প্রতিনিয়ত নিজেকে পরিবর্তন করে থাকে, যাকে বলা হয় মিউটেশন।

**উপসর্গ :** প্রাথমিক ভাবে ইনফ্লুয়েঞ্জার সংক্রমণ হলে সাধারণ ঠাণ্ডা লাগার মতোই লক্ষণ দেখা দেয়।

● হঠাৎ ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার বেশি জ্বর। ● গলায় বেশ ব্যথা। ঢোঁক গিলতে কষ্ট। ● সর্দি-কাশি, নাক দিয়ে জল পড়া। ● মাথাব্যথা। ● কিছু ক্ষেত্রে ডায়ারিয়া। ● শরীর দুর্বল হয়ে যাওয়া। ● নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া।

● কিছু ক্ষেত্রে বমি-ভাব হওয়া কিংবা বমি হওয়া। তবে এখন যে ভাইরাসটির বাড়বাড়ন্ত তার মূল উপসর্গ সর্দি, কাশি, নাক দিয়ে অনবরত জল পড়া, গা ব্যথা, মাথা ব্যথা ইত্যাদি। জ্বর আসছে কিন্তু পরে। এটি দ্রুত বাড়ছে এবং পরিবারের একজন আক্রান্ত হলে অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। এটাও ফ্লু ভাইরাসের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলে একে নতুন এক ধরনের ফ্লু ভাইরাস বলছেন বিশেষজ্ঞরা। মিউটেশনের ফলে নতুন ধরনের ফ্লু ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতাও সাংঘাতিক হয়। খুব সহজেই মানুষ তাতে আক্রান্ত হন এবং এর ফলে এই ভাইরাস দ্রুত অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। আর আক্রান্তদের মধ্যে বেশির ভাগেরই কোনো প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না। আর তখনই ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর আকার নিতে পারে।

**ইনফ্লুয়েঞ্জার ধরন :** মোটামুটি তিন ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হন মানুষ। একটি সাধারণ, মরশুমি ইনফ্লুয়েঞ্জা। দ্বিতীয়টি হলো মহামারীর আকার ধারণ করে এমন ইনফ্লুয়েঞ্জা। তৃতীয়টি হলো জুনোটিক ইনফ্লুয়েঞ্জা। যা প্রাণী থেকে ছড়ায়। যেমন— বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু ইত্যাদি। সোয়াইন ফ্লু -এর সংক্রমণও বেশি দেখা দেয়। এছাড়া অ্যাডিনো, আরএস, প্যারা-ইনফ্লুয়েঞ্জা, মেটানিমোর মতো ভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত হয় এই সিজন চেঞ্জের সময়।

**ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধের সেরা উপায়**

● অনেকেই মনে করেন ফ্লু-এর প্রতিষেধক নিলে এমনিতেই আর এই রোগ হবে না। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। আবার বহু মানুষ এই প্রতিষেধক নিতে অনীহা প্রকাশ করেন। কারণ তাঁরা মনে করেন ইনফ্লুয়েঞ্জা কোনো রোগই নয়। কিন্তু এই হেলাফেলায় আক্রান্ত হয়ে যান অনেকেই। ইনফ্লুয়েঞ্জা দু'-তিন সপ্তাহে শেষ হয়ে গেলেও কারও কারও সাইনাস, কানে সংক্রমণ, নিউমোনিয়া, হৃদযন্ত্রের সমস্যা, মস্তিষ্কের প্রদাহের মতো সমস্যা দেখা দেয়।

● বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস বারবার চরিত্র বদলায়। তাই আগে থেকে প্রতিষেধক নিলেও অনেক সময় কাজে আসে না। তবুও বর্ষার আগেই ভ্যাকসিন নিয়ে নিতে পারলে অনেকটা সুরক্ষা মিলবে, বিশেষ করে বয়স্কদের।

● ফ্লুয়ে আক্রান্ত ব্যক্তি হাঁচি, কাশির সময়ে অবশ্যই নাক, মুখ রুমালে ঢাকবেন। নিয়মিত ভাবে রোগীর হাত ধোয়া দরকার।

● এই সময়ে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে জল পান করা জরুরি। আর ভালো করে বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন।

● অনেকের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে। কম বয়স বা বয়স্ক মানুষ, ক্যানসারের রোগীদের জন্য অবশ্যই অ্যান্টিভাইরাল নিতে হবে। অ্যান্টিবায়োটিক নেওয়ার ফল কিছু নেই, কারণ ঠাণ্ডা লাগলে বা ফ্লু ভাইরাস ঠেকাতে এর কোনো কার্যকারিতা নেই।

● পাশাপাশি বাড়িতে যাঁর ইনফ্লুয়েঞ্জা রয়েছে তিনি এবং বাদবাকি সদস্যদের মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। যাঁর ফ্লু হয়েছে তাঁর থেকে দূরে থাকুন যতটা সম্ভব।

● ফ্লু ঠেকানোর আরেকটি পথ, থাকার জায়গাটি পরিচ্ছন্ন রাখা।

**ফ্লু প্রতিরোধে খাওয়াদাওয়া**

● এই সময় খাদ্যতালিকায় বিভিন্ন অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি খাবারগুলি বেশি করে রাখুন। যেমন আদা। আদা সংক্রমণ কমাতে ভীষণভাবে সাহায্য করে। বিশেষ করে গলার সংক্রমণ। এছাড়াও কাঁচা হলুদ খান। এর মধ্যে রয়েছে কারকিউমিন। এটি দুর্দান্ত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। প্রতিদিন আমলকী খান। এর মধ্যে থাকা ভিটামিন-সি ইনফেকশন কমাতে সাহায্য করে।

● এই সময়ে কাজু, কিশমিশ, আমন্ড খান। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এবং মিনারেল যেগুলি আমাদের ইমিউনিটিকে বুস্ট করতে সাহায্য করে।

● বিভিন্ন ধরনের বীজ যেমন, কুমড়োর বীজ, তরমুজের বীজ খান। এতে রয়েছে বিভিন্ন অ্যামাইনো, অ্যাসিড যা সংক্রমণের বিরুদ্ধে কাজ করে।

● এছাড়াও সকালে একমুঠো করে অঙ্কুরিত ছোলা খান। এর মধ্যে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন এবং ফাইবার।

● এছাড়াও মাছ, মাংস, ডিম, বিভিন্ন ভাল, সয়াবিন, দুধ, ছানা, স্মুদি ইত্যাদি প্রোটিনযুক্ত খাবার খান।

**হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা :** কারণ অনুযায়ী হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করলে ইনফ্লুয়েঞ্জার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। এতে যে সমস্ত ওষুধ কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে তাহলে রাসটক্স, ব্রাইওনিয়া, জেলসিমিয়াম, তবে কখনোই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া নয়, কারণ চিকিৎসক তাঁর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ওষুধ নির্বাচন এবং ওষুধের শক্তি নির্বাচন করে থাকেন।

# কপিল মুনির সাগরে শ্রীরামের ভারত

**হীরক কর**

কয়েক লক্ষ বছর আগে গঙ্গা মর্ত্যে ছিলেন না। কিন্তু, ছিল সাগর সৈকত। কপিল মুনির আশ্রম। সগর রাজার ষাট হাজার পুত্রকে মুক্তি দিতে ভগীরথ গঙ্গাকে এনে মিলিয়ে দিলেন সাগরে। গঙ্গার ছোঁয়ায় স্নানের পর কপিল মুনির আশীর্বাদে অভিশাপ মুক্ত হলেন সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র। পৌরাণিক সময়ে কপিল মুনি ছিলেন। আজও আছেন। আধুনিক গঙ্গাসাগর মেলার ভিড়েও তিনি আছেন এবং সমান প্রাসঙ্গিক।

কথা হচ্ছিল কপিল মুনির মন্দিরের পাশে থাকা কুটিরের নাগা সাধুদের সঙ্গে। গেরুয়া পোশাক পরা সন্ন্যাসী জটাজুটধারী নাগা সাধুদের ভিড়ে বেমানান। প্রশ্ন ছিল, আপনারা নাগাদের ডেরায়? কেউ কিছু বলে না। পরিষ্কার বাংলাভাষায় উত্তর আসে, 'নাগা সম্প্রদায়ের সাধু ছাড়া মন্দিরের চারপাশের কুটিরে আর কোনও সাধুর বসার অধিকার নেই। নির্জন সাধন ক্ষেত্রে নাঙ্গা হয়ে নাগা গুরুর দেখানো পথে সাধন-ভজন। এখানে সেভাবেই বসতে হবে কেউ বলে দেয়নি। সাধনা তো মনের ঘরে। ভিড়ের মাঝেও তা চলে।' অকপট ত্রিবেণীর তরুণ ও প্রৌঢ় পোশাক পরা নাগা সাধু কৃষ্ণানন্দ গিরি ও কিশোর গিরি। দুজনের গুরুই নাগা সাধু। ওরা দুই ভাই। বালক বয়সেই নাগা সাধুদের সান্নিধ্যে এসে সাধু হয়ে যাওয়া। বোধের ঘরে পরমাত্মার অন্বেষণ।

এ আধ্যাত্মিক ভারত। বর্ণ-বৈচিত্র্যের গঙ্গাসাগর মেলায় নাগা সাধুদের দর্শন; তাঁদের ছবি তোলা, মেলায় আসা বহু মানুষের, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের বাড়তি আকর্ষণ। এমন পরিবেশে আধ্যাত্মিক অনুভূবের মনের দরজা কি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে? উত্তর দেন প্রবীণ সাধিকা। 'কষ্ট কমে গেলে অন্তরাত্মার খোঁজ কেউ করে না। এই দেখ না, এখানে রটেছে সকারি ব্যবস্থা। কোটি কোটি টাকা খরচ। আবালবৃদ্ধবণিতা সবাই আসতে পারছে। বীরভূমের কোটর থেকে আমরাও আসছি বাউল মন নিয়ে রাধা বেশে কৃষ্ণ খোঁজে। যমুনা তো গঙ্গার সাথে এখানেও আসছে। এই তীরে রাধা কৃষ্ণ আসবে না তা কি হয়! কিন্তু যা হল দেখলে তো, রাধা-কৃষ্ণ খোঁজার সব চেষ্টা কেমন ধুলোয় মেশাতে পারলো চব্বিশ ঘণ্টার জন্য হলেও ঠিকাদাররা।'

আশ্চর্য, মহিলা সাধকের ছোট্ট কুটিরেও ঠিকাদার কাহিনি। জানা গেল, শৌচালয় ব্যবহার করতে গিয়েই জেনেছেন সব কিছু। চব্বিশ ঘণ্টার বেশি জল সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিল ঠিকাদারদের একটা বড় অংশ। দাবি দাওয়া মেটানো নিয়ে ঝামেলা। গঙ্গাসাগর মেলার প্রাণভোমরা পিএইচই-র বড় কর্তাদের মাথায় হাত। শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করে সমস্যার সমাধান।

প্রশ্ন তুললেন গঙ্গাসাগর মেলায় পঞ্চাশ বছর ধরে আসা স্বেচ্ছাসেবীদের জনৈক কর্ণধার। অনুচ্চ কণ্ঠে তাঁর জিজ্ঞাসা, 'মেলা পরিচালনার প্রধান অথরিটি কে? জেলা প্রশাসন নাকি ঠিকাদার সংস্থাগুলি। এই যে স্বেচ্ছাসেবীদের কলকাতা থেকে বয়ে আনা কুড়ি লিটার পানীয় জল শৌচকর্মে দিতে হলো, জল নেই বলে রান্না না করতে

পারায় অবাঙ্গালিদের দেওয়া ভোজন মাটিতে বসে খেতে হলো, এটা কি সুস্থ সংস্কৃতির লক্ষণ। বাঙ্গালি বলে লজ্জার নয়। আমরা কি সত্যিই শিক্ষিত হয়েছি! পাইপে জল সরবরাহ বন্ধ করে যে জেহাদ হল, যদি আগুন ধরে যেত কে দায় নিতো? এত আধুনিক সুন্দর মেলা যে এক লহমায় লণ্ডভণ্ড হতো। কোথায় থাকতো প্রযুক্তির বড়াই।'

যা কিছু হোক, সত্যেরে লও সহজে! মেনে আর মানিয়ে চলো। তবেই তো তুমি ভারতের আধ্যাত্মিক বোধের অনুভূতিতে মন স্নিগ্ধ করেছ। ভুলে যাও অন্ধকার। জ্বেলে দাও আলো। সাদা পোশাকের সাধুদের ভাষা শৃঙ্খলার বার্তা দিয়ে। বার্তা দেন কুলপির উত্তর রাজারামপুরের গোপাল। মূর্তি সেজে ভারতের চন্দ্রযান সাফল্যের কথা তুলে ধরেছেন গোপাল মণ্ডল। সকালে সাগর সৈকতে সূর্যের প্রথম আলো সোনালি রং মাখা শরীর নিয়ে বলে ওঠেন, বহুরুপী স্ট্যাচু সাজা আমার পেশা। আমার এই ছোট্ট থলিতে যে যা দেয় তা দিয়েই অন্ন যোগাড়। পরনে শুধু ধুতি। আদুর গায়ে সোনালি রং মাখানো। ঠাণ্ডা লাগছে না? 'ধুর, কীসের ঠাণ্ডা!' হাসতে হাসতে জবাব দিলেন গোপাল। আকাশে তখন চক্কর কাটছে ড্রোন।

বলি আরেক গোপালের গল্প। ইনি গোপাল মণ্ডল। দক্ষিণ বারাসাতের বাসিন্দা। দক্ষিণ বারাসাত থেকে চলে এসেছেন চা বিক্রি করতে। শুধু গঙ্গাসাগর মেলায় নয়, উনি চা বিক্রি করতে যান দিল্লি, মুম্বাইতেও। মুম্বাইতে যখন গণেশ উৎসব হয় তখন গোপাল পৌঁছে যান সেখানে। ১৭ তারিখ সাগরমেলা শেষ হলে গোপাল ছুটবেন প্রয়াগরাজ। তারপরের এক মাস গঙ্গা যমুনা সঙ্গমই হবে গোপালের ঠিকানা। খবর তো মেলা প্রাঙ্গণে ভূরি ভূরি। অপার বিস্ময় বিশ্বাস নিয়ে ভারতবর্ষের প্রায় সব রাজ্যের মানুষ সাগর তীরে। বিশ্বাস, মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে নাই-বা হলো স্নান পৌষের যে কোনও দিনে ডুব দিলেই হল। কত হাজার মাইল পথ বেয়ে শিবের জটা থেকে নেমে ভক্ত ভগীরথের কথা শুনে কপিল মুনির পদপ্রান্তে এসে পৌঁছলেন গঙ্গা। এ গঙ্গাকে ছুঁয়ে ডুব দিয়ে শীতল হয়ে ফিরতে হবে নিজের ঘরে। হাজারো দেহাতি মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত 'গঙ্গা মাঈ কী জয়'। 'কপিল মুনি কী জয়'। লাখো ভক্তের পদধূলিতে ধন্য পশ্চিমবঙ্গের গর্বের গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গণ। প্রার্থনা নীরবে প্রশাসনের একাংশের, যেন কোনও গণ্ডগোল না হয়। অধিকারের অহংকারের নীরব বলপ্রয়োগে। এ দেশের মানুষের সাফল্য যে চাঁদের দেশেও পৌঁছে গেছে।

বেলা গড়াতে কেটেছে কুয়াশা। দাঁড়িয়ে আছি অনন্ত সমুদ্রের সামনে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অগাধ বিস্ময় নিয়ে। কাটেনি মেঘ। ভেজা ভেজা ঠান্ডা হওয়ায় চলেছে তীর্থযাত্রীদের পুণ্য ডুব। পূজার্চনা। ঘাটে ঘাটে খোল-করতালের শব্দ। তালে তালে নেচে চলেছেন দুই মহিলা জলে দাঁড়িয়ে আছেন এক যুবক। তাঁর পিঠে চেপে আছেন আরও এক জন। পিঠের যুবককে নিয়েই সাগরসঙ্গমে ডুব দিলেন তিনি। জল থেকে উঠে দু'জনের মুখে যেন পুণ্য অর্জনের হাসি!

এই হাসির নেপথ্যে আছে গল্প। পিঠে ওঠা যুবকের নাম ভরত সেহন লোধি। তাঁর দু'টি পা জন্ম থেকেই ছোট। পায়ের পাতাও বাঁকা। তাই হাঁটতে পারেন না। এই প্রতিবন্ধকতা যাতে পুণ্য অর্জনে বাধা না হয়, সে জন্যই ভরতকে পিঠে চাপিয়ে গঙ্গাসাগরে এসেছেন ছোটেলাল। বন্ধুকে পিঠে চাপিয়ে সাগরে ডুব দিয়েছেন, আবার পিঠে চাপিয়েই বন্ধুকে নিয়ে গিয়েছেন কপিল মুনির আশ্রমে।

শুধু ভরত নন, প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে বিশ্বাসের ডুব, সাক্ষী রইল সাগরসঙ্গম। প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে গঙ্গাসাগরে ডুব দিয়েছেন মহারাষ্ট্রের ৯২ বছরের সুমিত্রা নিরে। বয়সের ভারে হাঁটতে পারেন না। তাই হুইলচেয়ারে চাপিয়ে দিদি শাশুড়িকে জলের কিনারায় নিয়ে গিয়েছেন নাতজামাই মুকুন্দ গাড়েকর। পরিবারের অন্য সদস্যদের সাহায্যে ধরাধরি করে সুমিত্রাকে জলে স্নান করিয়েছেন তাঁর নাতজামাই।

বহুরঙা ভারতের স্রোত এসে মিশেছে এই মিলন সাগরে। এমন দিনে সাগরদ্বীপে চলে গঙ্গাস্নান, গঙ্গাপুজো, পিতৃতর্পণ, বৈতরণী পার এবং আরও নানা কিছু। পাশাপাশি মানুষ উপভোগ করে সাগরদ্বীপের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মেলা। মূলত স্নান চলে তিন দিন। প্রবল ঠাণ্ডাতেও গঙ্গাসাগর জমজমাট। প্রেস এনক্লেভের সামনে দাঁড়িয়ে সেই আবহমান স্রোত দেখছি। গায়ে লাগছে সাধারণ ভারতের পরশ। কে একজন বললে ২০০ কেজি ওজনের এক মহিলা চলতে চলতে বসে পড়েছেন। ছুটে গেলাম ২ নম্বর রাস্তার মাঝ বরাবর। ৬২ বছরের ফুলপাত্তি দেবীর অবস্থা ভালো নয়। উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা তিনি। ৬২ বছরই বয়সেই একাধিক অসুখে জর্জরিত তিনি। ২০০ না হোক, দেড়শো কেজি ওজন হবে তাঁর। সত্যিই বসে পড়েছেন রাস্তায়। ছুটে এলেন ভারত সেবাশ্রমের স্বেচ্ছাসেবকেরা। এল স্ট্রেচার। মাকে স্ট্রেচারে চাপিয়ে পুণ্যস্নানে চললেন ছেলে বীরবিক্রম সিংহ। স্ট্রেচার বইতে হাত লাগালেন স্বেচ্ছাসেবকরা। আধ ঘণ্টার অপেক্ষা। পুণ্যস্নানে হাসি ফুটেছে ফুলপাত্তির মুখে। সেই হাসির আলো ছড়িয়েছে ছেলের মুখেও।

**সাগরদ্বীপের গঙ্গাসাগর যেন মিনি ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের প্রায় সব রাজ্যের মানুষের ঢল কপিলমুনির মন্দির প্রাঙ্গনে। নানা ভাষা নানা পরিধানের রঙে কলরবে মুখরিত সুন্দরবনের সাগরদ্বীপ।**

অনেকটা 'ওয়ানস্ আপোন এ টাইম'। ঠিক ১৩ বছর আগের কথা। নিজের স্ত্রী ও সদ্যোজাত সন্তানকে নিয়ে ছত্তিশগড় থেকে কলকাতায় এসেছিলেন যুবক স্বামী। স্ত্রীর মানসিক চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসেন তাঁরা। তখন চলছিল গঙ্গাসাগর মেলা। সেই ভিড়ের স্রোতে তাল রাখতে না পেরে আলাদা হয়ে যান একদিকে স্ত্রী-পুত্র, অপরদিকে স্বামী। আর কেউ কাউকে খুঁজে পাননি। তখন স্ত্রী-পুত্রকে ছাড়াই ছত্তিশগড় ফিরে যেতে হয় স্বামীকে। ওই অবস্থায় স্ত্রী-পুত্রের আশ্রয় হয় প্যাভলভ মানসিক হাসপাতালে। কিন্তু স্বামী ছত্তিশগড়ে ফিরে গিয়েও দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। প্রচণ্ড পারিবারিক চাপের কাছেও মাথানত করেননি। বরং বারবার ছুটে এসে গঙ্গাসাগর মেলায় খুঁজে চলেছেন স্ত্রী ও পুত্রকে। প্রত্যেক বছর গঙ্গাসাগর মেলায় এসে খোঁজ করেন নিজের

স্ত্রী-সন্তানের। তারপর ফিরে যান ছত্তিশগড়ে। কিন্তু নিজের মনে বিশ্বাস ছিল অটল। একদিন ঠিক খুঁজে পাবেন স্ত্রী ও সন্তানকে। কিন্তু মাঝে কেটে গিয়েছে যৌবনের ১৩টি বছর। ২০২৫ সালেও চলছে গঙ্গাসাগর মেলা। এবার তাঁর প্রার্থনা যেন শুনেছেন ঈশ্বর। এটাই মনে করেন স্বামী ললিত বারেথ। কারণ তিনি স্ত্রী-সন্তানকে খুঁজে পেয়েছেন। আর এই কাজে মাধ্যম হয়েছে কলকাতা পুলিশের ফুলবাগান থানার উদ্যোগ। স্ত্রী গুবারির সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছেন স্বামী ললিত বারেথ।

২০১০ সালেই ললিতের স্ত্রী ২৭ বছরের গুবারিকে পুলিশ উদ্ধার করে দমদম বিমানবন্দরের সামনে থেকে। তখন তাঁর কোলে ১১ দিনের শিশু। মানসিক সমস্যা-সহ পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করেছিল। তারপর বিসি রায় শিশু হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় সদ্যোজাতকে। কারণ সে অসুস্থ ছিল। আর গুবারি তখন কোনও তথ্যই পুলিশকে দিতে পারেননি। এই আবহে আদালতের নির্দেশে প্যাভলভ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এরপর কালের গতিতে সময় কেটে যায়। কিন্তু দু'মাস আগে ফুলবাগান থানা একটি মেমো পায়। সেই মেমো পাঠায় প্যাভলভ হাসপাতাল। সেখানে উল্লেখ করা হয়, ১৩ বছর আগের সেই বধূ সম্পূর্ণ সুস্থ এবং বাড়ি ফিরতে চায়। এই পরিস্থিতিতে ওই বধূ শুধু বলতে পারেন যে তাঁর বাড়ি ছত্তিশগড়ে। এরপর শুরু হয় পুলিশের তৎপরতা। ছত্তিশগড় পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে কলকাতা পুলিশের ফুলবাগান থানা। আর ব্রোঞ্জের কারখানা আছে এমন এলাকার কথা জানতে চান সাব ইনস্পেক্টর মৌসুমী চক্রবর্তী এবং বিশ্বজিৎ সিনহা মহাপাত্র। শুরু হয় হোয়াটসঅ্যাপ চালাচালি। ওসি সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাসপুর পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আর তখনই বেরিয়ে আসে ঠিকানা। শক্তি থানার কিরারি গ্রামে গুবারির বাড়ি। শক্তি থানার পুলিশ সেখানে গিয়ে গুবারির পরিবারের সদস্যদের ছবি পাঠায় হোয়াটসঅ্যাপে। যা দেখে চিনতে পারেন গুবারি। তারপর পুলিশ স্বামী ললিতের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই তিনি ছুটে আসেন গঙ্গাসাগরে। গঙ্গাসাগর মেলায় আচমকাই স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয় স্বামী ললিতের। আর অপেক্ষা করেননি। নিয়ে যান নিজের স্ত্রী গুবারিকে।

সেদিন রাত থাকতেই বেরিয়ে পড়েছি মেলা প্রাঙ্গণে। পঞ্জিকা মতে, ৬টা ৫৮ মিনিটে পুণ্যস্নান শুরু হয়ে গেছে। কনকনে মকর সংক্রান্তির ঠাণ্ডা। কাতারে কাতারে মানুষ চলেছেন সাগরের বিভিন্ন ঘাটের দিকে। চলেছি ভিড়কে পাশ কাটিয়ে এই ভারতের বিশ্বাসকে সঙ্গী করে। ঘড়ি বলছে রাত আড়াইটে। এসে দাঁড়ালাম ৫ নম্বর ঘাটে। অসংখ্য মানুষ ভেপারের আলোয় সাগরের জলে ডুব দিয়ে পরমাত্মার সঙ্গে মিলন কামনা করছেন। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আকাশ, চরাচর, সাগরের জল দিগন্ত রেখায় লীন হয়ে যাচ্ছে। স্পষ্ট, অদ্ভুত অনুভূতি। সেই আধো-অন্ধকারে, দাঁতে দাঁত লেগে যাওয়ার মতো কনকনে ঠাণ্ডায় ছেলের ল্যামিনেট করা ছবি বুকে জড়িয়ে ধরে ডুব দিলেন বিমল মাইতি। পুণ্যস্নান। ছেলে বিবেকানন্দ আত্মঘাতী হয়েছেন তিন বছর আগে। উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদের মাছচাষি বিমল ডুকরে কেঁদে ওঠেন, 'ছেলেটা খুব ঠাকুর-ভক্ত ছিল। দেশের বহু তীর্থস্থান ঘুরেছে। ২৮ বছর বয়সে হঠাৎ যে কী হলো। ওকে গঙ্গাসাগরে স্নান করাতে এনেছি। মেলা দেখাতে এনেছি। এই ছবি নিয়ে হরিদ্বার, গয়া, বৃন্দাবন ঘুরে বেড়াচ্ছি।' কমলা হয় দিগন্ত। তারপর লাল। আস্তে আস্তে সাগরের কোল থেকে সূর্য মাথা উঁচু করেন। যেন ডুব দিয়ে উঠলেন। সেই ভোরের হাওয়ায় বিষাদ ঢেলে থিকথিকে ভিড়ে হারিয়ে যান বিমল। বেলার সঙ্গে বাড়তে থাকে সেই ভিড়।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সিংহভাগ মানুষ আসেন পুণ্যলাভের আশায়। যেমন, উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছেন আজাদ বাবা। তাঁর বাবা মারা গিয়েছেন। আজাদ গঙ্গাসাগরে এসেছেন তাঁর মা পার্বতীর একটি শাড়ি নিয়ে। আজাদের কাছে জানা গেল, 'মায়ের হার্টের সমস্যা রয়েছে। তাই তিনি এত দূরে গঙ্গাসগরে আসতে পারেননি। আমিই মায়ের শাড়ি নিয়ে এসেছি। সেটি সাগরে চুবিয়ে নিয়ে গিয়ে মাকে দেব। এতে মায়ের পুণ্যলাভ হবে। পুণ্যের আশায় ১০ বছরের ভাইঝি সন্ধ্যাকে নিয়ে মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র থেকে গঙ্গাসাগরে আসেন সীতারাম পহেলও।

সাঁঝ রাত, রাস্তার পাশে শুয়ে থাকা আম-ভারতকে পাশ কাটিয়ে এলোমেলো গলি ধরে চলেছি। ফের দেখা ভরতের সঙ্গে, 'লোকে বলে, সব তীর্থ বার বার, গঙ্গাসাগর এক বার। তবে এ নিয়ে দু'বার এলাম সাগরে। ২০১০ সালেও ছোটেলাল পিঠে চাপিয়ে মেলা ঘুরিয়েছিল।' বলতে বলতেই নিজের পায়ে হেঁটে তীর্থ করব।' বন্ধুর কথা শুনে সাগরের দিকে চেয়ে থাকেন নীরব ছোটেলাল। মেলার কোলাহলে মাইকের নিরবিচ্ছিন্ন ঘোষণার

মাঝে অনির্বচনীয় নীরবতা।

দুপুরে সাগরে স্নান সেরে কালনার আরতি সাহা ও জ্যোৎস্না পাল গুরুর লেজ ধরে বৈতরণী পার হলেন। পুণ্যার্থীদের একটা ভিড় তখন কপিলমুনির আশ্রমের পথে। পুজো দিতে আশ্রমে তখন প্রবল ভিড়। তা দেখে পুজো না দিয়েই ফিরে গেলেন অনেকে। ছেলে রণবীর ও মেয়ে ধর্মশীলা কুমারীকে নিয়ে বিহারের বৈশালী থেকে এসেছেন রামশকল চৌধরী। কপিলমুনির আশ্রমের ভিড় এড়িয়ে ধর্মশীলা চলেছেন, বিড় বিড় করে বলেছেন 'এই ভিড়ে পুজো দিতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। এখান থেকে আজই কলকাতায় যাব। দু'দিন কলকাতা ঘুরব।'

পুণ্যস্নানের জন্য ভিড় যে আরও বাড়বে, তা জেনেই ১৪ তারিখেই স্নান সেরে নিয়েছেন শশী সারদানারা। দিল্লির বাসিন্দা এই মহিলা সাত বন্ধুর সঙ্গে এসেছেন গঙ্গাসাগরে। শশী ও সরিতা গুপ্ত বেরিয়েছিলেন নাগা সাধু দর্শনে। আগ্রা থেকে আসা ওমপ্রকাশ সিংহের বেশ কয়েক জন মহিলাকে নিয়ে লাইন করে হাঁটছিলেন। যাতে হারিয়ে না যান, তাই পিছনের মহিলা সামনের জনের শাড়ির আঁচল আর একবারে সামনের মহিলা ওমপ্রকাশের চাদরের খুঁট ধরেছিলেন উত্তরপ্রদেশের জৌনপুর থেকে মা নির্মলা পাণ্ডেকে নিয়ে এসেছেন নাগেন্দ্র। নাগা সাধুর আশীর্বাদ নিতে ছেলেকে ঠেলে দেন নির্মলা। ফিরে এসে নাগেন্দ্রর আক্ষেপ, 'বাবা কী বললেন, কিছুই বুঝলাম না। এত ভিড়, ঠেলাঠেলি আর চিৎকার।'

ফেসবুকে ওদের 'রিলস' দেখেছিলাম। সাগরমেলায় ডিউটি করছেন। সাত সকালে দেখা ৪ নম্বর ঘাটে। যথারীতি রিলস বানাচ্ছেন। ডিউটিতে এসে মকর সংক্রান্তির স্নান সারেন ওই দুই মহিলা পুলিশকর্মী। বাঁকুড়ার সুদেষ্ণা পতি এবং বর্ধমানের সুমনা গড়াই জানান, তাঁরা পুলিশের প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। ডিউটি পড়েছে গঙ্গাসাগরে। থাকেন ব্যারাকপুরে। শনিবার নাইট ডিউটি করেছেন। রবিবার সকাল সকাল তাঁরা হাজির স্নান করার জন্য।

পুণ্যস্নান উপলক্ষ্যে মিনি ভারতবর্ষ সাগরদ্বীপের গঙ্গাসাগর। ভারতবর্ষের প্রায় সব রাজ্যের লাখো মানুষ কপিলমুনির মন্দির প্রাঙ্গনে। নানা ভাষা নানা পরিধানের রঙে কলরবে মুখরিত সুন্দরবনের সাগরদ্বীপ। এই দ্বীপের সৈকতে গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষ্যে প্রতি সন্ধ্যায় ধর্মীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলছিল গঙ্গাসাগর মেলার দু নং রাস্তার পাশে আধুনিক সুসজ্জিত মঞ্চে। ১১ জানুয়ারি রাতে অমাবস্যার ভরা কোটালের দশ ফুট উচ্চতার ঢেউয়ের ধাক্কায় এক রকম তছনছ সব আয়োজন। রাত শেষে ভোরের আলোয় অনুষ্ঠান মঞ্চের হাল দেখে মাথায় হাত মেলা কমিটির। সেই সঙ্গে যে সব সংস্থার অংশ নেবার কথা তাঁদের সকলের। সাগরের ঢেউ কী পণ্ড করে দেবে সব কিছু। নাকি সে শান্ত হবে রাত বাড়লে কোটাল ছাড়লে!

সন্ধ্যায় গঙ্গাসাগর মেলায় অবশ্য ভিড় মোটামুটি ভালই হয়েছে। সন্ধ্যায় উদ্বোধন হয় গঙ্গা আরতির। তা চলবে তিন দিন। এ দিন গঙ্গারতির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন কপিলমুনির আশ্রমের প্রধান পুরোহিত জ্ঞানদাস মোহন্ত। সাগর মেলাকে 'জাতীয় মেলা' হিসেবে ঘোষণার দাবি আগেই তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সুর শোনা গেল কপিল মুনির আশ্রমের প্রধান পুরোহিতের কণ্ঠেও। জ্ঞানদাস মোহান্ত বলেন, 'রাজ্য সরকার ভালো ব্যবস্থা করেছে। মোদির কাছে আবেদন এই মেলাকে জাতীয় মেলা ঘোষণা করা হোক।'

আরতি উপলক্ষ্যে বিকেলে কপিলমুনি আশ্রম সংলগ্ন প্রাঙ্গণ থেকে একটি শোভাযাত্রা যায় সমুদ্রতট পর্যন্ত। সন্ধ্যায় দেখা গেল, দলে দলে মানুষ চলেছেন গঙ্গারতি দেখার জন্য।

তিন নম্বর ঘাটে তখন বালির বস্তা ফেলে রাস্তা তৈরির কাজ চলছে। পুলিশ জানায়, জোয়ারের কারণে ঘাটের দশা বেহাল। সেটাই মেরামতির কাজ চলছে। দ্রুত এই কাজ শেষ করা হবে। ৩এ ঘাটের রাস্তা বন্ধ রাখা হয় অত্যধিক কাদার জন্য।

এসেছেন রাজ্যের মন্ত্রী-সান্ত্রীরাও। মেলা ঘুরে দেখেছেন তিন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, পুলক রায়, মানস ভুঁইয়া। অরূপ বিশ্বাসের দাবি, 'এক কোটির ওপর পুণ্যার্থী স্নান করেছেন এবারের মেলায়। প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ তীর্থযাত্রী এসেছেন। যা সর্বকালীন রেকর্ড। দেশের আর কোনও মেলায় এত লোক হয় না।' এই পরিসংখ্যানকে সামনে রেখে গঙ্গাসাগর মেলাকে ফের জাতীয় মেলার স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি। প্রতিবছর এখানে কোটি কোটি মানুষ আসেন তীর্থ করতে। কথিত, এই মকর সংক্রান্তির দিনেই নাকি দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের যুদ্ধ শেষ হয়েছিল। অশুভ শক্তির বিনাশের কারণেই এই দিন উদ্‌যাপন করা হয়। উদ্‌যাপনের মেলায় তখন পুণ্যার্থীদের ঢল। সেই ঢল চলেছে ঘাটের পথে। কপিলমুনির আশ্রমের দিকে। শুধুমাত্র আমাদের দেশের পুণ্যার্থীরা নয় গঙ্গাসাগরে এবছর ভিড় জমিয়েছেন বিদেশিরাও। সাগরমেলার বিপুল জনস্রোতে মিশে গিয়েছেন তাঁরা। অংশ নিয়েছেন সাগর কীর্তনেও।

এ বছর কিউআর কোডের মাধ্যমে জানা গেল মেলার খুঁটিনাটি। মোবাইলে কিউআর কোড স্ক্যান করলেই জানা যায়, পানীয় জল, অ্যাম্বুল্যান্স-সহ কী কী সরকারি পরিষেবা মিলছে কাছাকাছি জায়গা থেকে। সেই সঙ্গে কন্ট্রোল রুম থেকে মেলার আনাচ-কানাচে ২৪ ঘণ্টা সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি চালায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। অন্য দিকে, শুধুমাত্র ডিজিটাল মাধ্যমে নয়, বিশেষ ভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য ম্যানুয়ালি থাকছে একাধিক পরিষেবা। বিভিন্ন রকম চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে তাঁদের সুবিধার্থে।

প্রশাসনের দাবি, সাগর মেলায় মুড়িগঙ্গার অ্যান্টি ফগ লাইটের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। এই বিশেষ লাইটগুলো জেটি ও নদীর মাঝের হাই ভোল্টেজ টাওয়ারে লাগানো রয়েছে। এই লাইটের দৃশ্যমানতাও বেশি। ফলে সহজেই চোখে পড়ছে। পাশাপাশি ভেসেল চালকদের প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে। এছাড়াও রয়েছে ন্যারোকস্টিং সাউন্ড সিস্টেম। অল্প দৃশ্যমানতাতেও ভেসেল চালক তার গন্তব্যে সঠিকভাবে যাচ্ছে কিনা সেটা সাউন্ড সিস্টেমের মাধ্যমে বোঝা যায়। ফলে ভেসেলগুলো পুণ্যার্থীদের নিয়ে তাদের গন্তব্যস্থলে সঠিকভাবে যেতে পারছে।

মুড়িগঙ্গার বুকে আছড়ে পড়েছে দুপুরের সূর্য। রুপালি ছটা চিকচিক করছে মহানদীর বুকে। ছোটো স্টিমার জল কেটে রাজহাঁসের মতো চলেছে। নাম তাঁর 'পথের পাঁচালি'। পরিযায়ী সিগ্যালের দল জল ছুঁয়ে উড়ে চলেছে। একদল মানুষ উবু হয়ে বসে। পুণ্যস্নান সেরে ওরা কলকাতা হয়ে প্রয়াগরাজে চলেছেন। মহাকুম্ভ মেলায়। সামনে গঙ্গা দুরন্তগতিতে ছুটে চলেছে সাগর সঙ্গমে। দিগন্তে জলের সঙ্গে জল মিলেছে। কুয়াশায় আবছা। কুয়াশা কাটে। দূরের দৃষ্টি প্রজ্জ্বল হয়। সম্মুখে শ্রীরাম। শ্রীরামের মধ্যেই ভারত। যিনি রাম, তিনিই ভারত। ■

# সিউড়ী সরস্বতী শিশুমন্দিরে সরস্বতী পূজা ও বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ৩-৭ ফেব্রুয়ারি অরবিন্দ পল্লী সরস্বতী শিশুমন্দিরের সরস্বতী পূজা ও বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। মা সরস্বতীর বন্দনা দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। গত ৫, ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি— তিন দিন আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রতিদিন উদ্বোধনী সংগীত হিসেবে 'ধনধান্য পুষ্প ভরা' গানটি গাওয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। প্রথম দিন স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের উপর শিশুমন্দিরের শিশুরা 'বিলে থেকে বিবেকানন্দ' পুতুল অভিনয় করে। দর্শকদের খুব ভিড় হয়। তাঁরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। ৬ তারিখ আয়োজিত হয় প্রভাত শ্রেণীর শিশুদের অনুষ্ঠান। সঙ্গে প্রদর্শিত হয় একটি ম্যাজিক শো। সিউড়ী নগরের ম্যাজিশিয়ান নন্দকুমার ধীবর জাদু প্রদর্শনী উপস্থাপন করেন। ৭ তারিখ দিবা বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত শিশুদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রদর্শিত হয়। নৃত্য, গীত, আবৃত্তি ও নাটকের অনুষ্ঠান হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জুতা আবিষ্কার' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিচালনায় ছিলেন নৃত্য শিক্ষিকা ব্রতী সাধু। বিলে থেকে বিবেকানন্দ এবং জুতা আবিষ্কার নাটকটি পরিচালনা করেন শিশুমন্দিরের আচার্যা কাবেরী রায়। শিশুমন্দিরের বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন পরিতোষ হাজরা। অনুষ্ঠানের দিনগুলিতে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী যাঁরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাঁদের মঞ্চে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। শিশুমন্দিরের সভাপতি সুনীল কুমার বিষ্ণু অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। শিশুমন্দিরের আচার্যা এবং আচার্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। শিশুমন্দিরের প্রধান আচার্য ও সহ-প্রধান আচার্য নির্মল ঠাকুর ও অরবিন্দ চৌধুরীর ব্যবস্থাপনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়।

# জলপাইগুড়িতে সক্ষমের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান

গত ১ ফেব্রুয়ারি জলপাইগুড়ি বন্ধু সমিতি ক্লাব ও পাঠাগার মাঠে অনুষ্ঠিত হলো সক্ষম উত্তরবঙ্গ প্রান্তের ত্রিবার্ষিকী একদিনের দিব্যাঙ্গ ভাই-বোনদের নিয়ে ক্রীড়া অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রায় ৭০ জনের মতো দিব্যাঙ্গ ভাই-বোন অংশগ্রহণ করেন। ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন এসএসবি (পাঙ্গা সাহেব বাড়ি)-র ডেপুটি কমান্ড্যান্ট লোকেশ শর্মা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত, সক্ষমের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সভাপতি তনয় দাস প্রমুখ। বাহাদুর মুন্নাস হ্যাপি হোমের ছাত্রীরা একটি সুন্দর নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সকলের মনোরঞ্জন করেন। ৫০ মিটার দৌড়, ১০০ মিটার দৌড়, ২০০ মিটার দৌড়, গামলায় বল ফেলা, অভিভাবিকাদের নিয়ে খেলা, ট্রাইসাইকেল রেস, লোহার বল ছোড়া প্রভৃতি দিব্যাঙ্গ ভাই-বোনদের নিয়ে খেলাগুলি সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন ক্রীড়া শিক্ষক অশ্বিনী সরকার, সন্তোষ সাহা, সোনা সেন, ভ্রমর সেন। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন রোটারি ক্লাব জলপাইগুড়ি, অ্যাক্সিস ব্যাংক কর্তৃপক্ষ, এসএসবি সাহেব বাড়ি। সক্ষমের স্থানীয় সদস্যরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ফঃ ৪

# সিটিজেন্স এমপাওয়ারমেন্ট ফোরামের উদ্যোগে আলোচনাসভা

গত ২৫ জানুয়ারি সিটিজেন্স এমপাওয়ারমেন্ট ফোরামের উদ্যোগে কলকাতায় স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সভাঘরে অনুষ্ঠিত হয় 'জ্বলছে বাংলাদেশ— অস্তিত্ব সংকট হিন্দুদের'-শীর্ষক আলোচনাসভা। আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. রাকেশ দাশ, শিক্ষাবিদ শক্তিপ্রসাদ মিশ্র, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও রিপাবলিক বাংলা চ্যানেলের সংবাদ উপস্থাপিকা স্বর্ণালী সরকার এবং বিশিষ্ট আইনজীবী দেবাশিস লাহিড়ী। আলোচনাসভায় বক্তারা বর্তমান বাংলাদেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি, সেই দেশে হিন্দুদের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা তাঁদের বক্তব্যে তুলে ধরেন। প্রতিবেশী দেশের এই ভয়াবহ প্রেক্ষাপট থেকে শিক্ষা নিয়ে ভারতীয় হিন্দুদের সচেতন হওয়ার বিষয়টিতে তাঁরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁরা বলেন যে, হিন্দুসমাজে বিভাজন সৃষ্টির অসংখ্য প্রয়াস প্রতিনিয়ত চলছে। উলটো দিকে নারায়ে তকবির, আল্লাহু আকবর স্লোগানে তামাম জেহাদি শক্তি একজোট।

তাঁদের বক্তব্যে উঠে আসে যে, হিন্দুসমাজের সার্বিক জাগরণ ছাড়া ভারতীয় উপমহাদেশ-ব্যাপী জেহাদ এবং এই কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা অসম্ভব। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট আইনজীবী অভিজিৎ চক্রবর্তী।

# অন্ধ ছাত্র-ছাত্রীদের অর্থদান নিরঞ্জন হালদার স্মৃতিরক্ষা সমিতির

সিউড়ী তথা বীরভূম জেলার একজন আদর্শ শিক্ষক ও প্রকৃত সমাজসেবক ছিলেন নিরঞ্জন হালদাল, যিনি ছোড়দা নামেই ছিলেন বেশি পরিচিত। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর গচ্ছিত

অর্থের সুদ থেকে গত পাঁচ বছর ধরে দুঃস্থ মানুষ ও ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করে আসছে নিরঞ্জন হালদার স্মৃতিরক্ষা সমিতি। গত ৯ ফেব্রুয়ারি, সিউড়ী অরবিন্দ পল্লী সরস্বতী শিশুমন্দিরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিরঞ্জন হালদার স্মৃতিরক্ষা সমিতির উদ্যোগে ছোড়দার জন্মমাস পালন করা হয়। নির্ধারিত সময়ে বিকাল চারটেতেই হয় শঙ্খধ্বনি। এরপর প্রদীপ প্রজ্বলন করলেন সিউড়ী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী পূজ্যপাদ স্বামী বরদানন্দ মহারাজ, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মহাদেব চন্দ্র এবং অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার পুলক সিনহা। সংগীত পরিবেশন করেন মালা দাস, অসীমা মুখোপাধ্যায়, পল্লব বৈরাগ্য, সুব্রত নন্দন প্রমুখ। ছোড়দার স্মৃতিচারণ করেন প্রাক্তন প্রধান আচার্য মানব রায়, শিক্ষক পরিতোষ হাজরা, পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের মার্গদর্শক বিশ্বনাথ দে প্রমুখ। সিউড়ীর চারটি শিশুমন্দিরের ছাত্রছাত্রীদের এবং সেই সঙ্গে দৃষ্টিহীন দুই ছাত্র- ছাত্রীকেও ৫০০০ টাকা অর্থসাহায্য দেওয়া হয়। এছাড়া শ্রদ্ধা, কল্যাণ আশ্রম, লোকপ্রজ্ঞার সংস্থাকেও অর্থসাহায্য করা হয়। দৃষ্টিহীন ছাত্র সুপল মুর্মু একটি গান গেয়ে শোনান। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সমিতির প্রবীণ সদস্য লক্ষ্মণ বিষ্ণু। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমিতির অন্যতম সদস্যদ্বয় অসীম মণ্ডল, দেবব্রত মাহান্ত-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন শিক্ষক ও সাংবাদিক পতিতপাবন বৈরাগ্য। সমবেত কণ্ঠে রাষ্ট্রবন্দনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি হয়।

# মহাজাতি সদনে বিপ্লবী পরীক্ষিৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিবস উদ্‌যাপন

গত ২৮ জানুয়ারি বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী সংগঠন এবং বিপ্লবী পরীক্ষিৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরিবারের উদ্যোগে কলকাতায় মহাবোধি সোসাইটি হলে আয়োজিত 'অগ্নিযুগ স্মরণে'-শীর্ষক একটি আলোচনাসভায় বিপ্লবী পরীক্ষিৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা দেন বিচারক এবং রিসার্চ ইনস্টিটিউট অউ ইন্ডিয়ান ফ্রিডম মুভমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা বিপ্লব রায়। স্মারক বক্তৃতা শেষে হয় বইপ্রকাশ ও সংগীতানুষ্ঠান। গত ৩০ জানুয়ারি, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবার এবং বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী সংগঠনের উদ্যোগে কলকাতা-স্থিত মহাজাতি সদনে উদ্‌যাপিত হয় বিপ্লবী পরীক্ষিৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিবস। এদিন তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বহু দেশপ্রেমী নাগরিক। ১৮৮৯ সালের ৩০ জানুয়ারি পূর্ববঙ্গের খুলনা জেলার খর্ণিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন মাতা কমলিনী মুখোপাধ্যায় এবং পিতা গুরুচরণ মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র পরীক্ষিৎ। আর্তত্রাণে নিবেদিতপ্রাণ হওয়ার কারণে 'কাঙালদা' নামে সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন পরীক্ষিৎ চন্দ্র। অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দলের মতো বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বিপ্লবী বাঘা যতীন, ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্লবীর সংস্পর্শে আসেন। দীর্ঘ বিপ্লবী জীবনে তিনি একাধিকবার কারারুদ্ধ হয়েছেন, কারাগারে 'চুয়াল্লিশ ডিগ্রি'তে নির্যাতিত হয়েছেন। দেশমাতৃকার শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ এই বিপ্লবী ১৯৩৮ সালে জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন এবং খুলনা জেলার সাতক্ষীরা থেকে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি'র সদস্য নির্বাচিত হন। এদিন বিপ্লবীপরীক্ষিৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন বিপ্লবী পরীক্ষিৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাতি অমল মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সহধর্মিণী মঞ্জু মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতির সম্পাদক তরুণ বিশ্বাস এবং রাসবিহারী বসু রিসার্চ ব্যুরোর সম্পাদক তপন ভট্টাচার্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দেবজিৎ মুখোপাধ্যায় এবং অমল মুখোপাধ্যায়ের কন্যা অদিশা মুখোপাধ্যায়। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখা-সহ ড. দীপা দাস একাধিক দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন।

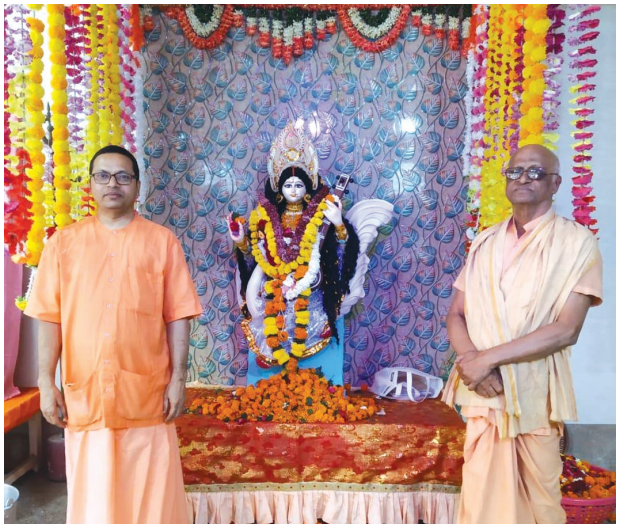

*খুব ধুমধাম সহকারে গুজরাটের আমেদাবাদে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে স্বামী শ্যামানন্দজী মহারাজের পরিচালনায় সরস্বতীপূজার আয়োজন করা যায়। মায়ের পাশে দণ্ডায়মান স্বামী বিষ্ণুপদানন্দজী মহারাজ এবং স্বামী মুকুলানন্দজী মহারাজ।*

# বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের ১৩১তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠান

গত ৬ ফেব্রুয়ারি বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতির উদ্যোগে কলকাতা-স্থিত মহাজাতি সদনে বীর বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের ১৩১তম জন্মদিন পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরগতিপ্রাপ্ত বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস এবং বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবারের মানুষজন। ১৮৯৫ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি নদীয়া জেলার পোড়াগাছা গ্রামে এক শিক্ষিত বনেদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন বসন্ত বিশ্বাস। বঙ্গের নীল বিদ্রোহের নায়ক দিগম্বর বিশ্বাস ছিলেন বসন্তের দাদু। কলকাতা থেকে দিল্লিতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তর উপলক্ষ্যে ১৯১২ সালের ২৩ ডিসেম্বর দিল্লিতে ভারতের বড়লাট হার্ডিঞ্জের শোভাযাত্রায় বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে বসন্ত বিশ্বাস বোমা নিক্ষেপ করে হার্ডিঞ্জকে গুরুতর আহত করেন এবং ১৯১৩ সালের ১৭ মে লাহোরে অত্যাচারী ব্রিটিশ প্রশাসন গর্ডনকে হত্যা করার চেষ্টা করেন। কৃষ্ণনগরে গ্রেপ্তারির পর বর্বর ব্রিটিশ সরকার নাবালক বসন্তের বয়স বাড়িয়ে পঞ্জাবের আম্বালা জেলে ১৯১৫ সালের ১১ মে বসন্তকে ফাঁসি দেয়।

এদিনের অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মেজ ভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসুর দৌহিত্র অভিজিৎ রায়। এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নাতি পার্থসারথি বসু, রাসবিহারী বসু রিসার্চ ব্যুরোর সম্পাদক তপন ভট্টাচার্য, বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সম্পাদক গোপাল চক্রবর্তী, আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানী, ১০৬ বছর বয়সি হরেন বাগচী, চন্দননগর ইয়ং মেন কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক এবং প্রবর্তক সঙ্ঘের সদস্য অনিল কুমার ঘোষ, গোপাল দত্ত, পুরশ্রী পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক অনুপ চট্টোপাধ্যায়, জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক স্বস্তিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সদস্য অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়, চট্টগ্রাম পরিষদের সহ-সম্পাদক প্রদীপ কুমার দত্ত প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের পরিবারের সদস্য সুদীপ বিশ্বাস ও সুতপা বিশ্বাস। 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে' গানটির সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেন রিনি দাস। দেশাত্মবোধক গান করেন কবি ও লেখিকা চিন্ময়ী বিশ্বাস, চন্দ্রাণী কর্মকার ও ধ্রুব হালদার।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন 'বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতি'র সম্পাদক তথা বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের নাতি তরুণ বিশ্বাস। এদিনই নদীয়া জেলার বাদকুল্লায় বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতির উদ্যোগে বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের একটি আবক্ষ মূর্তি উন্মোচিত হয়।

# তীর্থক্ষেত্র ত্রিবেণী

# বাঙ্গালি হিন্দুত্বের অতীত ও বর্তমান

**পল্লব মণ্ডল**

ধর্মীয় অর্থে তীর্থস্থান বলতে বোঝায় যে স্থানে দেবতা বা স্রষ্টার পূজা, প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয় এবং যে স্থানে গমন করলে মানুষ পাপ থেকে মুক্ত হয়। বঙ্গদেশের গঙ্গাসাগরের সমসাময়িক আরেক পবিত্র তীর্থক্ষেত্র হলো সুক্ষ্মক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত সপ্তগ্রামের ত্রিবেণীধাম। হুগলি জেলার গঙ্গাতীরে ২২° ৫৮' ১০' উত্তর অক্ষাংশে ও ৮৮° ২৬' ৪০' পূর্ব দ্রাঘিমায় এই স্থান অবস্থিত। তীর্থের চূড়ামণি এই ত্রিবেণী সম্পর্কে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ও সাধকরঞ্জনের ত্রিপদী ছন্দের কাব্যেও স্তুতি ও মূলাধার ছিল প্রকট। ত্রিবেণীস্নানের মূলাধার হলো, যেখানে ইড়া (ভগবতী গঙ্গা), পিঙ্গলা (যমুনা নদী) ও সুষুম্না (সরস্বতী নদী) এই তিনটি নাড়ি একসঙ্গে মিলিত হয়েছে। অন্যদিকে, ইড়া হলো ধমনী যার মধ্যে শুদ্ধ শোণিত প্রবাহিত হয়, পিঙ্গলা হলো শিরা যার মধ্যে দূষিত রক্ত প্রবাহিত হয় পুনরায় শুদ্ধিকরণের জন্য এবং সুষম্না হলো স্নায়ুতন্ত্র যা সকল প্রকার মানব উত্তেজনা ও অনুভূতির উৎসস্থল। এই তিন প্রকার নাড়ি মিলনস্থল হলো ত্রিবেণী। তাই ত্রিবেণীতে স্নান করলে সাধকের সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হয়, জ্ঞানলাভের পথ প্রশস্ত হয় এবং স্নানার্থী অপার্থিব শান্তিলাভ করে।

বিশ্বের দরবারে ভারতের কুম্ভমেলা কয়েক বছর আগেই স্বীকৃতি পেয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় সমাবেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এটি। পুণ্য লাভের জন্য এক শ্রেণীর মানুষ কুম্ভ স্নানকে আবশ্যিক বলে গণ্য করেন। ২০১৭ সালে UNESCO কুম্ভমেলাকে ভারতের অনবদ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বলে ঘোষণা করেছে। যদিও এর বিভিন্ন ধাপ রয়েছে। সাধারণ কুম্ভমেলা হয় প্রতি চার বছর অন্তর। অর্ধকুম্ভ হয় প্রতি ছ' বছর অন্তর হরিদ্বার ও প্রয়াগরাজে। পূর্ণকুম্ভ হয় প্রতি বারো বছর অন্তর। বৃহস্পতি ও সূর্যের অবস্থানের ভিত্তিতে কুম্ভমেলার চারটি নির্ধারিত স্থানে (যথা— প্রয়াগ, হরিদ্বার, উজ্জয়িনী ও নাসিক) পূর্ণকুম্ভ হয়। বৃহস্পতি বৃষ রাশিতে অবস্থান করলে উজ্জয়িনীতে এবং বৃহস্পতি ও সূর্য সিংহ রাশিতে অবস্থান করলে নাসিকে কুম্ভমেলা বসে। বারোটি পূর্ণকুম্ভের পরে অর্থাৎ ১৪৪ বছর পরে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে বসে মহাকুম্ভমেলা। অন্যদিকে, প্রচলিত কাহিনি অনুযায়ী, সমুদ্রমন্থনের সময় গরুড়দেব অমৃতের কলস নিয়ে পলায়নের সময়ে কলস থেকে চার ফোঁটা অমৃত পৃথিবীতে পড়ে। এই স্থানগুলিই হয়ে ওঠে কুম্ভমেলার চার ক্ষেত্র।

তবে বঙ্গপ্রদেশেও একসময়ে কুম্ভমেলা প্রচলিত ছিল, যার কথা ভুলে গেছে বিগত অনেকগুলি প্রজন্ম। বঙ্গপ্রদেশে ইসলামি দস্যুদের অনুপ্রবেশ এবং অত্যাচারের ফলে মুছে যায় ত্রিবেণীকুম্ভের নাম। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী তিন নদীর সঙ্গমস্থল ত্রিবেণীতে আনুমানিক ১৩১৯ খ্রিস্টাব্দে শেষবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছিল কুম্ভমেলা। ৭০৩ বছর অপেক্ষার পর সাধুসন্তদের প্রচেষ্টায় ২০২২-এ পুনরুদ্ধার হলো বঙ্গভূমির কুম্ভমেলা।

প্রাচীনকালে এই ত্রিবেণী মুক্তবেণী নামেও পরিচিত ছিল। স্থানীয় ইতিহাসবিদ অশোক গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'ত্রিবেণী কুম্ভমেলার সঙ্গে গঙ্গাসাগর মেলার একটা যোগ ছিল। তৎকালীন সাধুসন্তরা গঙ্গাসাগর মেলা শেষ হওয়ার পর পদব্রজে ত্রিবেণীতে আসতেন। মাঘ সংক্রান্তি অর্থাৎ বিষুব সংক্রান্তির দিন তারা স্নান করতেন। এই দিনটাকেই অনুকুম্ভ

হিসেবে ধরা হতো ত্রিবেণীতে। সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী শিক্ষা ও সংস্কৃতির তীর্থভূমি ছিল'। স্কন্দপুরাণ অনুযায়ী কুশদ্বীপের রাজা প্রিয়বন্ত'র মোট সাতজন পুত্র (অগ্নিধ্র, মেধাতিথি, বপুষ্মান, জ্যোতিষ্মান, দ্যুতিষ্মান, সবন ও ভব্য) ত্রিবেণীধাম সংলগ্ন এই স্থানে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সংলগ্ন সাতটি গ্রামে যথা বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়িয়া, নিত্যানন্দপুর, কৃষ্ণপুর, দেবানন্দপুর, শিবপুর এবং বলদঘাটিতে তারা তাদের আশ্রম তৈরি করেছিল। তাই এর নাম সপ্তগ্রাম। ১২৯২ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি সুলতানির সিপাহসালার জাফর খান গাজি ত্রিবেণী আক্রমণ করলে তার নির্দেশাধীন তুর্কি সেনা ত্রিবেণীতে প্রচুর হত্যা চালায়। হিন্দুদের ধর্মীয় শোভাযাত্রা বন্ধ করে দেয় ও ত্রিবেণীর পালযুগে নির্মিত একটি বিষ্ণু মন্দির ভেঙে দেয়। এর পাশাপাশি সে হিন্দুদের জমায়েত নিষিদ্ধ করে এবং কুম্ভমেলা বন্ধ করে দেয়।

এমতাবস্থায় বর্ধমানভুক্তির মহারাজা ভূদেব রায় ত্রিবেণী পুনরুদ্ধার ও হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধযাত্রা শুরু করেন। ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দের মাঘী পূর্ণিমার দিন ইটাচুনার কাছে মহানাদের প্রান্তরে রাজা ভূদেব রায় এবং জাফর খান গাজির মধ্যে প্রবল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মহারাজা ভূদেব রায় সুলতানি সেনাকে পরাস্ত করলে বর্ধমানের হিন্দু সেনা ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রাম বিজয় করে ত্রিবেণীধামে পুনরায় হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠা হয় এবং পুনরায় কুম্ভমেলা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৫০৫ সালে পাণ্ডুয়ার (মালদা) সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ওড়িশা আক্রমণের জন্য এই অঞ্চল দখল করে বহু মন্দির ধ্বংস করে। সপ্তগ্রামের নাম রাখা হয় 'হুসেনবাদ'। 'কাফের' হিন্দুদের জমায়েত নিষিদ্ধ করে ত্রিবেণীর কুম্ভমেলা পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ করে দেয়।

অবশেষে বহুকাল পর ২০২২ সালে হুগলীভূমিপুত্র সুদূর আমেরিকাপ্রবাসী বস্টনের ইতিহাসবিদ ও বিশিষ্ট সমাজসেবী কাঞ্চন ব্যানার্জি, আমেরিকা নিউইয়র্কের অধিবাসী শ্রীকান্ত মুখোপাধ্যায় এবং ত্রিবেণী বাঁশবেড়িয়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী অমিত সাউয়ের তত্ত্বাবধানে পুনরায় এই মেলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। গঠন করা হয় ত্রিবেণী কুম্ভ পরিচালন সমিতি। পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র দেশের সর্ব পন্থের সাধুসন্তদের পথনির্দেশে ও স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে নিয়ে সুসংগঠিতভাবে কুম্ভমেলা ও পুণ্য কুম্ভস্নানের আয়োজন করা হয় ১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি মাঘী সংক্রান্তি ভৈমী একাদশী তিথিতে। সকল সাধু সন্ন্যাসী, মুনি ঋষিগণ ত্রিবেণীর অন্তর্গত গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর সঙ্গমস্থল সপ্তর্ষি ঘাটে জড়ো হয়েছিলেন।

কথিত যে এই ঘাটে মৈত্রী, অত্রি, পুলস্ত, পুলহ, ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র সপ্তঋষি তপস্যা করেছেন। এই বিরাট কর্মযজ্ঞের নাম দেওয়া হয়েছিল 'ত্রিবেণী কুম্ভমেলা'। ২০২৩ এর ২৬ ফেব্রুয়ারি ৯৮তম মান কী বাত অনুষ্ঠানে বঙ্গতীর্থ ত্রিবেণী নিয়েই মনের কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিন বছর আগে এই মহোৎসবটির পুনরারম্ভ এবং ৮ লক্ষেরও বেশি ভক্তের সমাগমের কথা উল্লেখ করে আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত সকলকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, আপনারা কেবলমাত্র একটি প্রথাকে জীবিত করে তুলছেন তা নয়, বরং ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষাও করছেন।'

ত্রিবেণী কুম্ভ পরিচালন সমিতির সভাপতি কাঞ্চন ব্যানার্জি ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা বলেন, ২০২৫-এর ত্রিবেণী কুম্ভ আরও ভব্য রূপে সেজে উঠছিল। আনুমানিক ১৫ লক্ষের বেশি ভক্তের সমাগম হয়। ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি সাধুসন্তদের সমাগম; শক্তিপীঠের পুষ্প, জল ও মৃত্তিকা সমর্পণ, দিবারুদ্রাভিষেক, দ্রযজ্ঞ, ধর্মসভা, গঙ্গারতি, আদিত্য হৃদয়মন্ত্র, রাজকীয় পরিক্রমা, সাধুদের অমৃত স্নান, সাধু ভোজন, ধ্বজ অবতরণ এবং তৎপর সমাপণ প্রভৃতি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে। যমুনা নদী স্রোত হারিয়ে আজ বিলুপ্ত, সরস্বতী নদী নিজস্ব স্রোত হারিয়ে বিলুপ্তির পথে, শুধুমাত্র গঙ্গা বয়ে চলেছে। কিন্তু ত্রিবেণীর পবিত্র স্নান ও কুম্ভমেলা আজও সগৌরবে বর্তমান। কুম্ভ মেলাকে অনেকেই নিছক একটি ধর্মীয় সমাবেশ হিসেবে দেখতে পারেন। কিন্তু এর বিবর্তন হয়েছে মানবতার উৎসব রূপে, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে জমায়েত হয়। হিন্দুত্বের এই পুনর্জাগরণ ভারতমাতাকে আবার পরম বৈভবশালী করার পথনির্দেশক। ▯

# বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ঠাকুর ওঙ্কারনাথ দেব

**অধ্যাপক গোপাল চক্রবর্তী**

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানের বর্বর সেনাবাহিনী অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পূর্ববঙ্গের (পূর্ব পাকিস্তান) নিরীহ সাধারণ মানুষদের উপর। ছাত্র যুবক, শ্রমিক পুলিশ কেউ বাদ যায়নি। প্রথমে পাকবাহিনীর বাঙ্গালি সৈনিকরা প্রতিরোধের চেষ্টা করলেও তারা অচিরেই পিছু হটতে বাধ্য হয়। পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকবাহিনী বন্দি করে পাকিস্তানে নিয়ে গেছে। পাকবাহিনী প্রথমে পূর্ববঙ্গের শহরগুলি দখল করে, তারপর আক্রমণ চালায় গ্রামের দিকে। নিবিচারে গণহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, ব্যাপক লুটতরাজ সেদিন পুর্ববঙ্গের নিত্যকার ঘটনা। পাকহানাদার এবং তাদের সহযোগী রাজাকার আল বদর আল শামস প্রভৃতি জল্লাদের দল সেদিন হিন্দুদের হত্যা, হিন্দু নারীদের ধর্ষণ, হিন্দু গ্রামগুলি ধ্বংস করার এক নির্মম খেলায় মেতে উঠেছিল। প্রায় এক কোটি বাঙ্গালি হিন্দু সেদিন ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল।

সব রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সযত্নে এড়িয়ে চলা মহাত্মা সীতারামের অন্তর সেদিন বিচলিত হয়েছিল পূর্ববঙ্গের এই নারকীয় ঘটনায়। বিশেষত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেপ্তার এবং রাওয়াল পিণ্ডির কারাগারে বন্দি থাকার ঘটনায় তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। তাঁর মুক্তিলাভের জন্য ভগবৎ-চরণে ঠাকুরের আকুল প্রার্থনা। ঠাকুর ছিলেন প্রার্থনার শক্তিতে অচল বিশ্বাসী। ভগবানের কাছে ঠাকুর একক প্রার্থনা করে তৃপ্ত হলেন না, ভক্তদের ত্রৈকালিক প্রার্থনায় বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য সংযুক্ত করলেন এক ঐতিহাসিক স্তবক।

'মুক্তিদায়িনী মা তোর চরণকমলে।
কাতর প্রার্থনা মাগো করিগো সকলে।।
মুজিবুর রহমান বাংলার প্রাণ।
সত্বর তাহারে মাগো কর পরিত্রাণ।।'

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ভাগীরথী মঠে হয়েছিল অসুরবিনাশিনী কালীপূজা। পূর্ববঙ্গের নিপীড়িত মানুষের জন্য ঠাকুরের হৃদয় বেদনায় আকুল হয়ে উঠল। পূজা শেষে গঙ্গাবক্ষে প্রতিমা নিরঞ্জনকালে শেষবারের মতো মায়ের চরণে কাতর প্রার্থনা জানালেন— 'যা মা এই গঙ্গা বেয়ে চলে যা পূর্ববঙ্গে। দুর্গতিনাশিনী! নিপীড়িত সন্তানদের তুই গিয়ে রক্ষা কর মা। হে অসুরদলনী। তুই ছাড়া আর কার সাধ্য আছে তাদের অত্যাচার উৎপীড়নের কবল থেকে রক্ষা করে।'

পূর্ববঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের মরণপণ সংগ্রাম, আর পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাঁদের প্রতি অনবরত করুণাধারা বর্ষণ করে চলেছেন করুণাঘন বিগ্রহ শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ দেব। পাক হানাদারদের বর্বর আক্রমণের হাত থেকে পূর্ববঙ্গের মানুষদের পরিত্রাণের জন্য করুণাময় সীতারাম সেদিন সত্যি ত্রাতার ভূমিকা পালন করেছিলেন। ভারতীয় সেনার ইস্টার্ন কমান্ডের সেনাধ্যক্ষ জগজিৎ সিংহ আরোরা রণাঙ্গণে যাওয়ার আগে ঠাকুরের আশীর্বাদধন্য হলেন, ঠাকুর তাঁকে অভয়দান করে, নিজের হাতের রক্ষাকবচ খুলে পরিয়ে দিলেন তাঁর হাতে। তাঁর সহযোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্রে শক্তি সঞ্চারিত করে দিলেন। শ্রীগুরুর অমোঘ আশীর্বাদ শিরোধার্য করে প্রবল প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করে, আত্মসমর্পণে বাধ্য করলেন অনন্তশ্রী সীতারামের আশীর্বাদে বলীয়ান সেনাধ্যক্ষ জগজিৎ সিংহ অরোরা। বিজয়ী বীর উন্নতশিরে ফিরে এলেন স্বভূমিতে। সেই সময়ে পূর্ববঙ্গের অনেক পত্রপত্রিকা সীতারামের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন।

বাংলাদেশের অন্যতম বামপন্থী নেতা মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কৃতজ্ঞ চিত্তে ঠাকুরের চরণে প্রণতি জানিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর আওয়ামি লিগের অনেক প্রবাসী নেতাও ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে ছিলেন। শোনা যায় বঙ্গবন্ধুরও ইচ্ছা ছিল সীতারাম দর্শনের। স্বাধীন বাংলাদেশেও সীতারামের পবিত্র পদার্পণ তিনি প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু নিয়তির অমোঘ বিধানে তাঁর কোনো ইচ্ছাই পূর্ণ হয়নি।

২৪ মার্চ ১৯৭২, ঢাকা, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'বাংলার বাণী' নামক দৈনিক পত্রিকায় শ্রীশ্রী ঠাকুরের ছবিসহ— 'স্বাধীনতা সংগ্রামের নেপথ্য সৈনিক ওম্‌কারনাথ' শিরোনামে সাংবাদিক আলি নূরের একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

'শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওম্‌কারনাথ, তিনি একজন সন্ন্যাসী। ন্যায়, সততা আর মানবতাই হচ্ছে তাঁর ধর্ম। আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী এই সন্ন্যাসীর লক্ষ লক্ষ ভক্ত ছড়িয়ে আছেন ভারতবর্ষের আনাচে কানাচে। বঙ্গের বুকে যখন জল্লাদ হায়েনার দল নৃশংস হত্যালীলা শুরু করেছিল, তখনই তিনি তাঁর ভক্তদের বঙ্গের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁরই নির্দেশে বাংলাদেশের জন্য লাখো লাখো ভক্ত চাঁদা সংগ্রহ করেছিলেন, শরণার্থী শিবিরে শরণার্থীদের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। শুধু বঙ্গের স্বাধীনতার জন্যই নয়, বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্যও তিনি ভগবানের কাছে আরাধনা করতেন। তিনি তাঁর ভক্তদের মুজিব বাবার মুক্তির জন্য প্রতিদিন তিনবেলা প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।'

মৌলানা ভাসানী, তোফায়েল আহমদ, শেখ ফজলুল হক মণি-সহ বাংলাদেশের অনেকেই হৃষীকেশের আশ্রমে গিয়ে সাধুবাবার সঙ্গে দেখা করেছেন। সাধুবাবা সবাইকে একই কথা বলেছেন— 'বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই।' বুকভরা আশা নিয়ে সেদিন ফিরে এসেছেন মৌলানা ভাসানী, তোফায়েল, মণি এবং আরও অনেকে। আর তার কিছুদিন পরই বিশ্বের মানচিত্রে 'বাংলাদেশ' নামে একটা নতুন দেশের আবির্ভাব ঘটল বিশ্ববাসীর স্বীকৃতি নিয়ে।' বাস্তবিক পার্শ্ববর্তী কোনো দেশের স্বাধীনতার জন্য একজন ধর্মাত্মা সাধকের এহেন প্রয়াস বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। □

# মহাসমারোহে সম্পন্ন হলো ত্রিবেণী কুম্ভ

**বিজয় আঢ্য ।।** 'কোথায় পাবো তারে?'— এই জিজ্ঞাসা নিয়েই 'চলেছে মানব যাত্রী / যুগ হতে যুগান্তর পানে।' কুম্ভ সেই চলার পথে এক একটি মাইল স্টোন। এবারের প্রয়াগের কুম্ভ হলো পূর্ণমহাকুম্ভ, আর পশ্চিমবঙ্গের ত্রিবেণীর কুম্ভ অনুকুম্ভ। গত ১২ ফেব্রুয়ারি, পুণ্য মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে, মাঘ সংক্রান্তির সকালে সাধু-সন্ন্যাসী-ভক্তদের সঙ্গে অমৃত (শাহী) স্নানের অংশীদার হতে পা বাড়িয়ে ছিলাম ত্রিবেণীর সপ্তর্ষির ঘাটের দিকে। গান-বাজনা-নাচের সঙ্গে হাজার হাজার পুণ্যার্থীদের সেই স্নান যাত্রা সত্যিই এক অনন্য আনন্দের শিহরণ জাগায়। ২০২২ সালে এই কুম্ভমেলা শুরু হলেও এর একটা ইতিহাস রয়েছে। প্রয়াগ সঙ্গম যদি হয় যুক্তবেণী, ত্রিবেণী সঙ্গম মুক্তবেণী। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কথায়— 'মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে...'। জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুসারে সূর্যদেব মকর রাশি থেকে কুম্ভ রাশিতে প্রবেশ করেন মাঘ সংক্রান্তিতে। তাই এই তিথি কুম্ভ সংক্রান্তি। আমেরিকা প্রবাসী কাঞ্চন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ব্রেণ চাইল্ড' এই কুম্ভের মতে— উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজ উত্তর প্রয়াগ, আর ত্রিবেণীর এই কুম্ভ দক্ষিণ প্রয়াগ। ত্রিবেণীর সপ্তর্ষি ঘাট মুখ্য কেন্দ্র। কিংবদন্তী এই --- সপ্ত ঋষি এই স্থানে তপস্যা করেছিলেন। বঙ্গভূমির সন্ন্যাসীরা প্রয়াগ সপ্ত থেকে ফেরার পথে মাঘ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে এখানে স্নান করতেন।

কুম্ভের পুরাণ কথা সকলেই কম-বেশি জানে। দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনে যে অমৃত উঠেছিল, তা একটা কলসে বা কুম্ভে রাখা হয়েছিল। সেই কুম্ভ থেকে অমৃত, জ্যোতিষশাস্ত্র মতে সূর্যের চারটি রাশিতে প্রবেশের মুহূর্তে ভারতবর্ষের চারটি স্থানে— প্রয়াগ, হরিদ্বার, উজ্জয়িনী ও নাসিকে ছিটকে পড়েছিল। তাই এই চারটি স্থানেই কুম্ভস্নান এবং সেই সূত্রে কুম্ভমেলা হয়ে থাকে। কিন্তু হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে? এই ইতিহাস কিন্তু জানার সুযোগ নেই। বঙ্গভূমিতে 'কুম্ভ' শব্দটির প্রয়োগ অমৃতকুম্ভ অর্থে ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের আগে নেই। সন্ত তুলসীদাস তাঁর রচিত রামচরিতমানসে 'মকর সংক্রান্তি স্নান'-এর উল্লেখ করেছিলেন। বক্তিয়ার খিলজীর আক্রমণের পর, অর্থাৎ, ১২৫০ থেকে ১৪০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গের দেড়শো বছরের ইতিহাস পাওয়া যায়নি। এই সময়কালে ভারতে তাম্রলিপ্তের মতো যে বেশ কয়েকটি বন্দর ছিল, তার মধ্যে সপ্তগ্রাম একটি। লক্ষণীয় যে, আদিসপ্তগ্রাম স্টেশন এখনও আছে। এই সাতটি গ্রামে পিতল, তাঁত প্রভৃতি শিল্প গড়ে উঠেছিল। কিন্তু মুসলমান আক্রমণে তা ধ্বংস হয়ে যায়। তবুও সমগ্র বঙ্গভূমি জুড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। ইতিহাস চর্চার এইসব উপাদান নিয়ে গবেষণা করলে ত্রিবেণী কুম্ভের ইতিহাসও হয়তো জানা যাবে।

মাঘ সংক্রান্তির দিন বেলা ১১টায় ছিল অমৃতস্নানের মুহূর্ত। সাধু-সন্ন্যাসীরা শাহী (অমৃত) শোভাযাত্রার পর এই পুণ্য ক্ষণে ত্রিবেণী সঙ্গমে নদীতে স্নান করলেন। স্নানপর্বের পর ভাণ্ডারা। প্রায় ১০০ জন নাগা সাধু এসেছিলেন এই কুম্ভে। বহু পুণ্যার্থী ও নাগরিক এই কুম্ভের তথা ভাণ্ডারার আয়োজনে বহু অর্থ ও সামগ্রী দান করেছেন। উদ্যোক্তাদের দাবি অনুযায়ী, এইবারের তিন দিন ব্যাপী ত্রিবেণী কুম্ভে দশ লক্ষ পুণ্যার্থী এসেছিলেন। বস্তুত মাঘ সংক্রান্তির দিন বেলা যতই বেড়েছে, পুণ্যার্থীদের ভীড় যেন ততই বাড়ছে, তা তো প্রত্যক্ষই করলাম। সব মেলায় যেমন হরেক রকমের দোকানপাট থাকে, এখানেও তাই ছিল। রুদ্রাক্ষের মালা এবং নানারকমের পূজার সামগ্রী, ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে ছোটোদের খেলনা পর্যন্ত। ইসকনকে তাদের প্রকাশিত গীতা গ্রন্থটি বিতরণ করতে দেখা যায়। এক বিশাল মাঠে আয়োজন হয়েছিল পৌরাণিক চিত্র প্রদর্শনীর। হিন্দু দেবদেবীদের মূর্তিও ছিল। সভার জন্য বিশাল মঞ্চ। এদিনের সকালে মঞ্চে হচ্ছিল সাধুসন্তদের সভা। সনাতন ধর্মের মাহাত্ম্যের কথা তাঁরা বলছিলেন। সঙ্গে ছিল ভক্তিগীতি। বিকেলের দিকে থাকত বিভিন্ন অনুষ্ঠান। যেমন ২০০ জন শিল্পীদের নিয়ে ছিল শ্রীখোল ও গৌড়ীয় নৃত্যের অনুষ্ঠান। মেলায় ভীড় নিয়ন্ত্রণ, শৌচাদির ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, মাইকের মাধ্যমে সময়োপযোগী বার্তা বারবার জানানো হচ্ছিল। কলকাতা ও বর্ধমানের দিক থেকে যেসব গাড়ি এসেছিল, সেগুলি রাখার ব্যবস্থাও ছিল যথাযথ। মেলা পরিচালন সমিতির স্বেচ্ছাসেবক ও স্থানীয় প্রশাসনের প্রয়াসও ছিল লক্ষণীয়। আগামীদিনে ত্রিবেণী কুম্ভ যে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। □

# প্রয়াগে সরস্বতীর অবস্থান বিজ্ঞানসম্মতভাবে স্বীকৃত

**গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়**

১৪৩১ সালের পূর্ণমহাকুম্ভ যোগ চলছে। কোটি কোটি পুণ্যার্থী প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করছেন। ১৪৪ বছর পর আসা এই মহাযোগের পুণ্যলগ্নে ত্রিবেণীতে স্নান করে মানুষ কলুষমুক্ত হচ্ছে।

প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর স্রোতধারা একত্রে মিলিত হয়েছে। গঙ্গার গেরুয়া জলে কালিন্দী যমুনার কালচে নীল জলের মিলিত হওয়া স্পষ্ট দেখা যায়। সরস্বতী এখানে অদৃশ্য। সরস্বতীকে অন্তঃসলিলা হিসেবে বর্ণনা করা হয়। গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের অনতিদূরে রয়েছে, এলাহাবাদ দুর্গ। জনশ্রুতি সেই দুর্গের এক কূপের জলে সরস্বতী নদী যুক্ত রয়েছে এবং সেখান থেকে জল অন্তঃসলিলা হয়ে ত্রিবেণীর সঙ্গমে এসে অন্য দুই নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

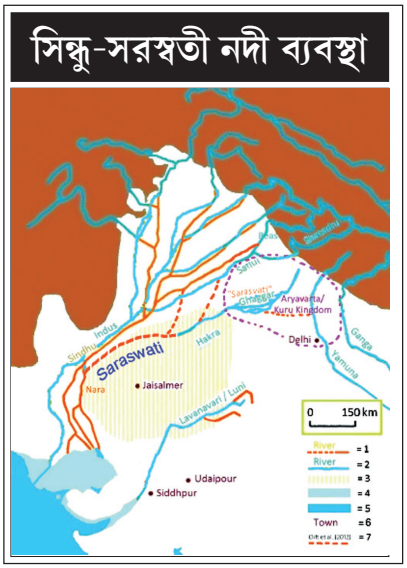


ঋগ্বেদে সরস্বতীকে নদীতমা বলা হয়েছে। গঙ্গা পতিত-পাবনী আর সরস্বতী সকল নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, নদীতমা। হিমালয়ের পাদদেশে সরস্বতী নদীর উপত্যকার ব্রহ্মাবর্তে একদা ব্রহ্ম সম্বন্ধে মানবমন প্রথম আবর্তিত হয়েছিল, হয়েছিল ভারতের সাংস্কৃতিক বিকাশের সূত্রপাত অতীতের সেই বৈদিক যুগে। সরস্বতী তখন ছিল চিরপ্রবাহী এক বিশাল নদী, হিমালয়ের তুষার গলা জলে ছিল যার উদ্ভব। গুজরাটের সৌরাষ্ট্রের কাছে সেই নদী সিন্ধু সাগরের জলে মিলিত হতো। তার এই বিশাল উপত্যকায়, আজ থেকে চার-সাড়ে তিন হাজার বছর আগে গড়ে উঠেছিল উত্তরে রাখিগড়ি থেকে দক্ষিণে লোথাল পর্যন্ত শতাধিক জনবসতি। পরবর্তী বিভিন্ন যুগে নানা কারণে সেই নদী একে একে নিজের জলের উৎসগুলি হারিয়ে এক শীর্ণধারায় রূপান্তরিত হয়। জনপদগুলি একে একে পরিত্যক্ত হয় এবং মরুভূমির বালির মধ্যে সমাহিত হয়ে পড়ে।

বর্তমানের সরস্বতী পরিচিত সুরসুতী নামে যা মার্কণ্ড ও ঘগ্গর নদীর জলের সঙ্গে মিলিত হয়ে আগের বিশাল উপত্যকার মধ্যে বেমানান ভাবে শীর্ণধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। তার প্রাচীন প্রবাহপথের নিদর্শন রয়ে গেছে মরুবক্ষে বেমানান ভাবে জন্মালো তৃণ, গুল্ম, উদ্ভিদের সারির মধ্যে যেখানে মাটির গভীর থেকে তুলে আনা জল ওপরের জলের মতো নোনা নয়। সেই জলের রেডিয়ো কার্বন ডেটিং করে বয়স বলা হচ্ছে কোথাও সাড়ে তিন হাজার, কোথাও-বা চার হাজার বছরের পুরাতন। বৈদিক যুগের সেই নদীতমা সরস্বতীকে ভূপৃষ্ঠে খুঁজে পাওয়া না গেলেও তার প্রবাহপথের নিদর্শন রয়ে গেছে। মাটির গভীরে।

সরস্বতীর আর এক নাম কুটিলা। এই নাম হয়তো প্রাচীন সরস্বতী অসরল প্রবাহপথের জন্য ছিল, হয়তো-বা যমুনার জলে তার শীর্ষ প্রবাহকে মিলিয়ে দিয়ে যমুনার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য ছিল। বৈদিক যুগে সরস্বতী নদীর সঙ্গে যুক্ত হতো যমুনা ও শতদ্রু। তখন সরস্বতীর প্রবাহপথ সিন্ধুনদের প্রায় সমান্তরাল ছিল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভূ-আন্দোলনের ফলে সরস্বতীর প্রবাহপথের এক অংশ, পঞ্জাবের রোপারের চারপাশের অংশ ক্রমে উচ্চতায় বৃদ্ধি পায়। ফলে শতদ্রু নদীর প্রবল বাঁক নিয়ে সরস্বতী থেকে পশ্চিমে সরে গিয়ে সিন্ধুর দিকে চলে যায়। যমুনাও পূর্বদিকে সরে গঙ্গায় গিয়ে মেশে। সরস্বতী হয়ে পড়ে ক্ষীণকায়া। তার তীরে গড়ে ওঠা হরপ্পা সভ্যতা ক্রমে লুপ্ত হয়ে যায়।

'স্বর্গলোক ও দেব সভ্যতা' নামক বইয়ে লেখক রাজ্যেশ্বর মিত্র বৈদিক ঋষি উদ্ধৃত করে স্বর্গ, মর্ত্য, দেবতা, আর্য, অনার্য, দস্যু, অসুর, রাক্ষস, পিশাচ ইত্যাদির বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় পাওয়া যায় দেবতারা ছিলেন গঙ্গানদীর অববাহিকার ঊর্ধ্বভাগে স্থিত হৈমবর্তবর্ষ বা দ্যুলোকের অধিবাসী এক কৃষিজীবী ও গোপালক সম্প্রদায়। সেই দেবভূমির বিস্তৃতি ছিল গঙ্গা নিকটবর্তী যমুনা ও সরস্বতী নদীর উচ্চ অববাহিকাতে। শতদ্রু নদীর উৎস অঞ্চলে ছিল কিন্নরদের বাস। ঋগ্বেবেদে দশম মণ্ডল থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি পঞ্চক্ষিতি ও স্বর্গাঞ্চলে প্রবাহিত অনেকগুলি নদীর নাম করেছেন সেই নদীগুলির নামের মধ্যে আজও অপরিবর্তিত রয়েছে।

বৈদিক যুগে সরস্বতী নদীর উৎসের অবস্থান উচ্চ হিমালয়ের তুষার ক্ষেত্রে গঙ্গা এবং যমুনার উৎসের কাছাকাছি ছিল। একই পর্বতের দুই দিকের দুই ঢালে প্রবাহিত হতো সরস্বতী ও যমুনার শীর্ষদেশীয় উপনদীগুলি। সরস্বতী নদীবাহিত দিকের পাহাড়ের ঢাল ছিল মৃদু কিন্তু যমুনা নদীর উপনদীগুলি খাড়া ঢালের দিকে বইত। ফলে খাড়া ঢালে প্রবাহিত যমুনার উপনদীগুলির শীর্ষদেশ ক্ষয় করার ক্ষমতাও ছিল অনেক বেশি। তার ফলে এক সময়ে যমুনা তার উপনদী বাটার তীব্র শীর্ষ ক্ষয়ের সাহায্যে পাওন্টাসাহিব ধুলের কাছে সরস্বতীর শীর্ষ প্রবাহকে অপহরণ করে নিজের জলে মিলিয়ে নেয়, শীর্ষবিচ্ছিন্না সরস্বতী হয়ে পড়ে শীর্ণকায়া। এভাবে সরস্বতীর প্রবাহ যমুনায় মিলিত হওয়ার ফলে ত্রিবেণীর প্রথম বেণীবন্ধনটি ঘটেছিল হিমালয়ের উচ্চ পার্বত্য ভাগে যা আমাদের পর্বতবাসী মুনি-ঋষিরা জানতেন। এই জন্যই যমুনা ও গঙ্গার সঙ্গমে যে সরস্বতীও উপস্থিত তাঁরা মানতেন। তাই আবাহনী মন্ত্রে প্রথমে সরস্বতীকে, তারপরে যমুনা এবং সর্বশেষে গঙ্গাকে আবাহন করা হয়। আধুনিক প্রযুক্তির যুগে ইসরোর অধীনস্থ ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টারের তোলা ছবিতেও পাওন্টাসাহিব ধুলের যমুনার দ্বারা সরস্বতীর জল অপহরণের বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যায়। □

# জাতীয় পুনর্জাগরণে কুম্ভমেলার গুরুত্ব

**উত্তম বেজ**

বর্তমান ভারতীয় সমাজে একটি বড়ো ন্যারেটিভ প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চলছে, যেখানে বলা হচ্ছে যে কেবলমাত্র মহাকুম্ভে একটি ডুব দিলেই পাপ মুক্তি হয় না। কথাটি সত্য, যদি কুম্ভ শুধুমাত্র হুজুগের বস্তু হয়। তবে, কুম্ভে যদি আস্থা, বিশ্বাস ও শুদ্ধ অন্তঃকরণ থেকে যোগদান করা হয়, তবে এটি মানুষের জীবনকে অবশ্যই পরিবর্তন করতে পারে। আসলে, আমরা এতটাই ভোগবাদী পাশ্চাত্য ভাবধারায় মগ্ন হয়ে গেছি যে ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে

পাপ-পুণ্যের মূল্যায়ন ভুলে গেছি। অথচ, হিন্দু সংস্কৃতিকে যদি আমরা নিজেদের জীবনের অংশ বলে গ্রহণ করি, তবে অবশ্যই এই ডুব দিয়ে পুণ্য অর্জন সম্ভব।

হিন্দুদর্শনে স্পষ্টভাবে শরীর ও আত্মাকে পৃথক সত্তা হিসেবে দেখা হয়। শরীর নশ্বর আর আত্মা চিরন্তন। কেবলমাত্র এক দেহ থেকে আরেক দেহে স্থানান্তরিত হয়মাত্র। হিন্দুশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে পূর্বজন্মের কর্মফলের ভিত্তিতেই পরবর্তী জন্ম নির্ধারিত হয়। তাই, যদি আমরা হিন্দু সংস্কৃতির সেই ৬৪টি সংস্কারের নিয়ম মেনে জীবনযাপন করি, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মফল অবশ্যই কল্যাণকর হবে। ভারতীয় হিন্দু সমাজ বারবার এই সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে জীবনকে পরিচালিত করেছে, যা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নয়, বরং সামগ্রিকভাবে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি নিশ্চিত করেছে। এই সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো তীর্থযাত্রা, যা ব্যক্তিকে সাংসারিক জীবন থেকে সাময়িকভাবে মুক্তি দিয়ে ত্যাগ ও ব্রতের পথে পরিচালিত করে। ভারতের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকা তীর্থস্থানগুলি আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করেছে। সে কারণেই ভারতবর্ষকে দেবভূমি, পুণ্যভূমি ও মোক্ষভূমি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

একটি ঐতিহাসিক বিষয় মনে রাখা উচিত যে, আজকের রাজনৈতিক ভারতের মানচিত্রের মতো অতীতের ভারত ছিল না। অতীতে ভারতবর্ষ ছিল একটি বৃহৎ সাংস্কৃতিক ভূমি, যার কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা ছিল না। অখণ্ড ভারতভূমি ছিল একটি আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক মানচিত্র, যা সমগ্র এশিয়া মহাদেশ এবং অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিল। এই সাংস্কৃতিক বিস্তারের অন্যতম মাধ্যম ছিল তীর্থস্থান ও ধর্মীয় সংস্কার, যা হিন্দু সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এক সময় বৈদেশিক আক্রমণের কারণে ভারতীয় সংস্কৃতির উপর একটি গভীর আঘাত এসেছিল। ইসলামি শাসনকালে অসংখ্য মঠ-মন্দির, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা হয়েছিল, জোরপূর্বক ধর্মান্তরণ ঘটানো হয়েছিল এবং ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে অবদমিত করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ শাসন এই ধ্বংসকাজকে অন্যরকমভাবে চালিয়ে যায়। তারা ভারতীয়দের মনে নিজেদের সংস্কৃতি সম্পর্কে সন্দেহ ও ঘৃণার জন্ম দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু হিন্দু সংস্কৃতি তার ভিত্তিকে কখনোই হারায়নি।

আজ যখন ইসলামিক বিশ্ব সন্ত্রাসবাদের দ্বারা বিপর্যস্ত এবং খ্রিস্টান বিশ্ব ভোগবাদ, ধর্মান্তরণ ও পারিবারিক বিচ্ছিন্নতার ফলে দিশাহীন, তখন ভারতীয় হিন্দু সমাজ তার পুরনো ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক শক্তির পুনর্জাগরণ ঘটাচ্ছে। কুম্ভমেলার মতো বিশাল শান্তিপূর্ণ জনসমাবেশ এই পুনর্জাগরণেরই প্রতীক। কোটি কোটি মানুষ পবিত্র সঙ্গমে স্নান করছে, আত্মশুদ্ধির সাধনা করছে এবং নিজেদের শিকড়ের সন্ধান করছে।

ভারতের এই পুনর্জাগরণ কেবল ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক নয়, এটি একটি বিশ্বজনীন বার্তা বহন করছে। যেখানে পাশ্চাত্য সমাজ নৈতিক ও ভোগবাদের সংকটে ভুগছে, সেখানে ভারত তার যোগ, বেদান্ত ও সনাতন দর্শনের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বকে নতুন দিশা দেখাচ্ছে। কুম্ভমেলার বিশাল জনসমুদ্র প্রমাণ করছে যে ভারতীয় সভ্যতা হারিয়ে যায়নি, বরং এটি আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে এসেছে, যা ভবিষ্যতে সারা বিশ্বের জন্য এক আলোকবর্তিকা হয়ে উঠবে। □

# কুম্ভমেলার অনুভব

**প্রদীপ মজুমদার**

গিয়েছিলাম গয়ায় বিষ্ণুপাদপদ্মে আমার এক অতি প্রিয়জন, ক্ষণজন্মা, অকালগতা ভাগ্নীর আত্মার কল্যাণ কামনায়। সেখান থেকে আর এক মোক্ষধাম কাশী বা বারাণসীতে। ইন্দোরের মহীয়সী মহারানি পুণ্যশ্লোকা অহল্যাবাঈ হোলকার দুই স্থানেই নির্মাণ করে দিয়েছেন মন্দির ও ঘাট। কিন্তু আজও হৃদয় ব্যথিত হয় মন্দিরের বাইরের পুরাতন নন্দী ভগবানের দিকে তাকালে। আজও নন্দী তাকিয়ে আছেন জ্ঞানবাপী মসজিদের দিকে, সেখানে ছিল আদি বিশ্বনাথের মন্দির, যা ভেঙে ঔরঙ্গজেব বানিয়েছিল জ্ঞানবাপী মসজিদ, যেমন করেছিল মথুরায় শ্রীকৃষ্ণজন্মভূমির উপর। গত ২১ জানুয়ারি দিদি ও স্ত্রীর ইচ্ছায় কুম্ভস্নানের উদ্দেশ্যে একাই বেরিয়ে পড়লাম সবাইকে হোটেলে রেখে। সকাল সাড়ে দশটার মধ্যেই তিন ডুব দিয়ে পুণ্যস্নান সারা হয়ে গেল কচ্ছপ দ্বার, নন্দী দ্বারের মধ্যে দিয়ে গিয়ে মোক্ষদ্বার ত্রিবেণী সঙ্গমে।

মোক্ষলাভ হবে কি না, পুণ্যলাভ হলো কি না, পাপক্ষয় হলো কি না, এসব প্রায় অবান্তর। আমি বা আমরা কতটুকু! স্রষ্টাই দ্রষ্টা। তিনিই বিচারক। আমি ভক্তিহীন, জ্ঞানহীন, তামসিক ও জড়। শুধু তীর্থযাত্রী হয়ে কৃত্য করে যাই, যদি কোনোদিন এসব থেকে মুক্তিলাভ হয়। আমিও সেই মহান সত্যদ্রষ্টা, সর্বলোক কল্যাণকারী ঋষিদের গোত্রজ, পুণ্যভূমি ভারত, দেবভূমি ভারত, মোক্ষভূমি ভারতে জন্মেছি। দেবগণের জন্মভূমিরূপে যা ত্রিলোকবিখ্যাত।

''দেবানাং জন্মভূর্মিযা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
বিবাহ, ক্রতবঃশ্চৈব জাতকর্মাদিকা ক্রিয়া।।''

'মানুষ শুধু রুটিতে বাঁচে না'— শয়তানকে প্রভু যীশুর উত্তর। দেবত্বে উত্তরণই সনাতনী হিন্দুদের লক্ষ্য। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যখন সংসার ত্যাগের পূর্বে তাঁর সব পার্থিব সম্পদ দুই স্ত্রী কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীর মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে দিতে চাইলেন, তখন মৈত্রেয়ী প্রশ্ন করলেন— কথং তেন অমৃতা স্যাম্। এসব দিয়ে কি আমি অমৃতা হব? যা আজও প্রাসঙ্গিক ও বিবেচ্য।

তাই এই অমৃতের লোভে হাজার হাজার বছর ধরে লক্ষ কোটি সনাতনী নর-নারী ছুটছেন অমৃত কুম্ভের সন্ধানে। 'সেই ট্র্যাডিশান সমানে চলছে'— এস.ওয়াজেদ আলি।

কুম্ভমেলা প্রাঙ্গণে এসে আমি হতবাক। একি দেখছি! মনে পড়ল মহাভারতের সঞ্জয়ের দৃষ্ট ও বর্ণিত সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ মহাত্মার বিশ্বরূপ।

'অনেক বক্ত্রনয়নমনেক কাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেক দিব্যাভরণং দিব্যানেকাদ্য তায়ুধম্।।'

এক বিরাট চৈতন্যস্বরূপ বহু হয়েছেন। আহা হা, ধন্যোহম্ ধন্যোহম্। এই স্থানেই সম্মিলিত ভারত, মহাভারত।

'কেহ নাহি জানে, কার আহ্বানে, কত মানুষের ধারা,
দুর্বার স্রোতে এর কোথা হতে, সমুদ্রে হলো হারা।'

প্রাদেশিকতা, নাম, গোত্র জাতি, বর্ণ সবই আপাতত এখানে অর্থহীন। মুমুক্ষু ঊর্ধ্বদৃষ্টি সনাতনী নর-নারী চলেছেন অমৃতস্নানে। কোনো মন্ত্র, পুরোহিতের প্রয়োজন নেই। দৃঢ়সংকল্প, দৃঢ়বিশ্বাসীরা চলেছেন শুধু একবার অমৃতে অবগাহন করতে। শুধু প্রার্থনা— মৃত্যোর্মাতংমৃত গময়।

বিকেলে হোটেলে ফিরে সন্ধ্যায় গেলাম বিশ্বনাথ ও আরতি দর্শনে। তার আগের দিন সন্ধ্যায় ক্রুজে করে দর্শন করেছি গঙ্গারতি। ক্রুজে ছিলেন গাইড রামদাস নিষাদ। তাঁদের পূর্বপুরুষ রামমিত্র নিষাদরাজ নৌকায় করে প্রভুরাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে নদী পার করে দিয়েছিলেন। 'সেই ট্র্যাডিশান সমানে চলছে'। আজও নিষাদরা নৌকা পরিবহণের কাজে যুক্ত। ভারতের সব প্রান্তের, রাজা, রানিদের এমনকী নেপালের মহারাজেরও তৈরি ঘাটগুলি ও মহাশ্মশানগুলির বর্ণনা ও ইতিহাস বলে চললেন গাইড্। নির্বাক শ্রোতা ও দর্শকরা অবাক হয়ে শুধু দর্শন করছেন বৃথিবীর প্রাচীনতম নগর, সৌধ ও ঘাটগুলি, যেখানে মৃত্যু বা দাহ হলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

পরদিন ভোর ৫-১৫ মিনিটে অর্থাৎ ২২.০১.২০২৫ তারিখে বেরিয়ে পড়লাম অযোধ্যায় বিরাজমান প্রভু রামলালা ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত মন্দির দর্শনে। ২২ জানুয়ারি মন্দির প্রতিষ্ঠা ও রামলালার মূর্তি প্রতিষ্ঠা দিবস। তাই নিরাপত্তার অত্যন্ত কড়াকড়ি ও প্রচুর ভক্ত ও বীর সমাগম। প্রতিষ্ঠা তিথিপূজা অবশ্য হয়ে গেছে ১১, ১২ ও ১৩ জানুয়ারিতে। যাইহোক বেলা সাড়ে দিনটেয় বাসে ও অটোয় চেপে পৌঁছলাম মন্দির প্রাঙ্গণে। জুতো ও মোবাইল ফোন রাখার এবং দর্শন শেষে সীতারসুইয়ে প্রসাদ দান সবই নিঃশুল্ক। সিংহভাগ দর্শনার্থীই উপবাসী ও সরযূনদীতে স্নান করে প্রভুর বালকমূর্তি দর্শন করছেন। এ শুধু একটি বালকের ধনুর্ধারী কষ্টি পাথরের মূর্তি ও মন্দির নয়। সনাতনী ভারতের হৃদপিণ্ড এখানে স্পন্দিত হচ্ছে। যে স্পন্দন আমাকেও শিহরিত করতে লাগল। স্বেদ, কম্প, পুলক, অশ্রু, শিহরণে আমার মতো মানুষের শরীরেও সাত্ত্বিক ভাব এলো। এই সেই পবিত্র ভূমি। যেখানে প্রভু জন্মেছিলেন। রামরূপে, ভগবান অবতরণ করেছিলেন বিশ্বত্রাস রাক্ষস বধের জন্য। 'পরিত্রাণায়সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্'। লঙ্কা জয়ের পরে লক্ষ্মণ বলেছিলেন, আসুন লঙ্কাতেও আমরা রাজ্য স্থাপন ও বসবাস করি। তার উত্তরে পাম বলেছিলেন— 'অপি স্বর্ণময়ী লঙ্কা, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী'। তিনি ফিরে এসেছিলেন এখানেই, লঙ্কা যাদের জন্মভূমি তাদের হাতেই তুলে দিয়ে। এই সেই পবিত্র ভূমি, যে ভূমি বহুবার রক্তে ভেসে গিয়েছে, নিরীহ, নিরস্ত্র, ভক্ত ও বহু সনাতনী বীরের রক্তে। নাগা সন্ন্যাসীদের রক্তে, এখানেই আত্মবলিদান দিয়েছেন কলকাতার দুই সহোদর ভাই, রাম ও শরৎ কোঠারি, রাজমন্মভূমির কলঙ্ক মোচনের জন্য, আরও কত শত বীর। আজ তাঁদের সংকল্প, আত্মবলিদান সিদ্ধ হয়েছে। তাঁদের সংকল্প— 'মন্দির ওহি বানায়েঙ্গে', আজ মূর্ত হয়েছে। কিন্তু এখনো বাকি মথুরায় কৃষ্ণজন্মভূমি ও আদি বিশ্বনাথের মন্দির, জ্ঞানবাপী মন্দিরের কলঙ্কমোচন।

তাই প্রার্থনা—

ওঁ তেজহসি তেজো ময়ি ধেহি।
ওঁ বীর্য্যমসি বীর্য্যংময়ি ধেহি।

গয়া, কাশী,প্রয়াগরাজের কুম্ভমেলা ও অযোধ্যা পরিক্রমায় আমার এই অনুভব বা বোধ হলো জাত-পাত, ধনবৈষম্য, প্রাদেশিকতা সব তুচ্ছ করে ধর্মীয় চেতনা, বিশ্বাস, পরম্পরা ও সংস্কৃত ভাষাই সমগ্র ভারতীয় সনাতনী হিন্দু সমাজকে দৃঢ়বদ্ধ করে রেখেছে। মথুরা, বৃন্দাবন, সোমনাথ, কামাক্ষ্যা, অমরনাথ, মানস সরোবর কৈলাশ থেকে কন্যাকুমারীকা পর্যন্ত সব হিন্দু তীর্থস্থানে গেলে একই অনুভব হয়। এজন্যই ভারতীয় সাধু, সন্ত, সন্ন্যাসী, ভক্তরা তীর্থ পরিক্রমা করেন। বিদ্যায় জ্ঞানলাভ হয়, কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শন ও অনুভবেই মানুষ ঋদ্ধ হয়। তাই পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'ধর্মই ভারতের মেরুদণ্ড।' □

# জাতীয় গেমসে পশ্চিমবঙ্গের সাফল্য

**নিলয় সামন্ত**

জাতীয় গেমসের আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিক্সের দলগত বিভাগে সোনা জিতে হ্যাটট্রিক করল পশ্চিমবঙ্গের মেয়েরা। এর আগে গুজরাটে, গোয়ার মাটিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় গেমসের এই বিভাগে সোনা এসেছিল। উত্তরাখণ্ডে জিতে এনিয়ে পর পর ৩ বার সোনা জয়ের রেকর্ড গড়লেন প্রণতি দাসরা। তবে জয়ের পরেও খুশি নন বিদিশারা। কারণ আগের বার মহারাষ্ট্রকে পেছনে ফেলে যখন সোনা জিতেছিল তাঁরা, তখন ব্যবধান ছিল অনেকটা। এবারও দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছে সেই মহারাষ্ট্র। তবে এবার তাদের সঙ্গে এরাজ্যের পয়েন্ট পার্থক্য ছিল দুই। অন্যদিকে তৃতীয় স্থানে শেষ করে ব্রোঞ্জ জিতেছে ওড়িশা।

পশ্চিমবঙ্গের সোনাজয়ী আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিক্সের দলের সদস্য ছিলেন প্রণতি দাস, বিদিশা গায়েন, প্রতিষ্ঠা সামন্ত, ঋতু দাস ও জিনিয়া দেবনাথ। গতবার খেলতে নেমেছিলেন ছয় জন। তবে এবার থেকে আন্তর্জাতিক জিমন্যাস্টিক্স সংস্থা নিয়ম পরিবর্তন করে। জানানো হয়, সর্বোচ্চ পাঁচ সদস্য রাখা যাবে দলে। তাই এবার পাঁচ সদস্যের দল পশ্চিমবঙ্গের। গতবারের দল থেকে এবার চোটের জন্য বাদ পড়েন তিয়াশা কুণ্ডু। দলের সঙ্গে যুক্ত হন প্রতিষ্ঠা সামন্ত। এর আগে ত্রিপুরার হয়ে জাতীয় গেমসে নেমেছেন তিনি।

২০১১ সাল থেকে নিয়মিত জাতীয় গেমসে নামা প্রণতি স্বীকার করেছেন যে বরাবরই এই ইভেন্টে ভালো ফলাফল করে এসেছে পশ্চিমবঙ্গ। সেই কারণে এবার মেডেল জয়ের খিদেটা বেশি ছিল। তবে সোনার হ্যাটট্রিক করার বিষয়টা আগে থেকে মাথায় ছিল না তাঁদের। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে শুধু লড়াইটা করে গেছেন। অপর প্রতিযোগী বিদিশার আক্ষেপ, মহারাষ্ট্রকে বড়ো ব্যবধানে পেছনে ফেলতে না পারায়। তিনি মনে করেন ব্যবধান আরও কিছুটা বেশি হওয়া প্রয়োজন ছিল। তাঁর এবার ব্যক্তিগত লক্ষ্য এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রায়ালে ভালো ফল করা।

পশ্চিমবঙ্গের দলের সঙ্গে জিএফআই

অফিসিয়াল হিসেবে ছিলেন অনুপ কুণ্ডু। যিনি আবার রাজ্য জিমন্যাস্টিক্স সংস্থার যুগ্ম সচিবও। গত দু'বারও দলের সঙ্গে ছিলেন তিনি। সোনা জয়ের হ্যাটট্রিকের সাক্ষী হতে পেরে খুশি অনুপ। তিনি জানান, জয়ের বিষয়ে আশাবাদী ছিলেন। ৩ বারের সোনা জয়ের সাক্ষী থাকতে পারাটা তাঁর কাছে একটা প্রাপ্তি।

জাতীয় গেমসে পশ্চিমবঙ্গের সাফল্যের ধারা অব্যাহত। গত ১২ ফেব্রুয়ারি জিমন্যাস্টিক্সে এল চারটি পদক। উত্তরাখণ্ডের মাটিতে আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিক্সের মহিলাদের বিভাগে সোনা জিতলেন প্রণতি দাস। গত ১১ ফেব্রুয়ারি মহিলা দল সোনা জিতেছিল। তারপর ১৩ তারিখও জিমন্যাস্টরা সাফল্য পেলেন। সকালটা শুরু হয়েছিল জিমন্যাস্টিক্সে পদক জয়ের মধ্য দিয়েই। মিক্সড পেয়ারে সোনা জিতলেন আব্দুল্লা চৌধুরি এবং শাহিনা গুপ্তা জুটি। এই জুটি ১৬.৩০ স্কোর করে সোনা জিতে নেন। এরপর সময় যত এগিয়েছে ততই পশ্চিমবঙ্গের পদকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এরপর মাঝিদা খাতুন অ্যারোবিক জিমন্যাস্টিক্সে মহিলাদের ব্যক্তিগত ইভেন্টে ১৬.৩৫ স্কোর করে রুপো জেতেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ব্রোঞ্জ আসে পশ্চিমবঙ্গের ঘরে।

অ্যারোবিক জিমন্যাস্টিক্সে পুরুষদের ইভেন্টে অনিকেত চক্রবর্তী ১৭.১৫ স্কোর করে ব্রোঞ্জ জেতেন। এরপর সন্ধ্যায় আসে স্বর্ণালি সেই মুহূর্ত। মাটিতে আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিক্সের মহিলাদের বিভাগে সবাইকে পিছনে ফেলেন সোনা জিতলেন এ রাজ্যের প্রণতি। ১০.৩০০ স্কোর করেন প্রণতি দাস। গত ১২ ফেব্রুয়ারি দলগত ইভেন্টেও সোনা জয় করেছিলেন এবার ব্যক্তিগত ইভেন্টেও সোনা জিতলেন। ২০১১ সাল থেকে জাতীয় গেমসে অংশ নিচ্ছেন প্রণতি। জিএফআই অফিসিয়াল হিসেবে উত্তরাখণ্ডে গিয়েছেন অনুপ কুণ্ডু। রাজ্য জিমন্যাস্টিক সংস্থার যুগ্ম সচিবও। তিনিও দলের এই পারফরম্যান্সে দারুণ খুশি। উল্লেখ্য, আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিক্সের পশ্চিমবঙ্গের সোনাজয়ী দলে ছিলেন প্রণতি দাস, বিদিশা গায়েন, প্রতিষ্ঠা সামন্ত, ঋতু দাস ও জিনিয়া দেবনাথ। অন্যবার ছয় অংশ নিলেও এবার নিয়ম পরিবর্তন হয়েছে। এবার থেকে আন্তর্জাতিক জিমন্যাস্টিক্স সংস্থার নতুন নিয়ম অনুযায়ী দলে থাকছেন পাঁচজন সদস্য।

এদিকে ১২ তারিখ আরও কিছু পদক এল এ রাজ্যের ঘরে। টেবিল টেনিসে মিক্সড ডাবলসে পদক নিশ্চিত করলেন ঐহিকা মুখোপাধ্যায় এবং অনির্বাণ ঘোষ জুটি। তারা ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছেন। অন্যদিকে মহিলাদের ডাবলসে ব্রোঞ্জ জিতলেন মৌমা দাস এবং ঐহিকা মুখোপাধ্যায় জুটি। জুডোতে ব্রোঞ্জ জিতলেন শানসা সরকার। সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গ এবার জাতীয় গেমসে ভালোই পদক জিতছে। এরাজ্যের পদকে সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। আর এর আগে ১০ ফেব্রুয়ারি জাতীয় গেমসে বিরাট সাফল্য পেল রাজ্য। টেবিল টেনিসের টিম ইভেন্টে জোড়া স্বর্ণপদক এল ঝুলিতে। পরুষ ও মহিলা দুই বিভাগেই সোনা জিতল। দুই বিভাগেই এরাজ্যের দল পরাজিত করে শক্তিশালী মহারাষ্ট্রকে। মহিলাদের বিভাগে এরাজ্য জয় পায় ৩-১ ব্যবধানে। অন্যদিকে, পুরুষদের বিভাগে ৩-০ ব্যবধানে জয় আসে। শক্তিশালী মহারাষ্ট্রকে হারিয়ে মৌমা, সৌরভরা বুঝিয়ে দিলেন জাতীয় স্তরে এখনো ফুরিয়ে যায়নি পশ্চিমবঙ্গ।

গ্রুপ পর্বে মরারাষ্ট্রের কাছে ৩-০ ফলে হেরেছিল পুরুষদের দল। তাই তারা ঠিক করেই নিয়েছিলেন বদলাটা ফাইনাল ম্যাচে নেবেন। করলেন ঠিক সেটাই। হাজারটা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও দাপটের সঙ্গে মহারাষ্ট্রকে উড়িয়ে দিলেন অনির্বাণ ঘোষ, আকাশ পাল, সৌরভ সাহা, রণিত ভঞ্জ, অনিকেত সেন চৌধুররা। প্রথম সিঙ্গলসে অনির্বাণ হারান যশ মোদীকে। দ্বিতীয় সিঙ্গলসে জয় পান আকাশ পাল। তৃতীয় লিঙ্কলসে জিতে স্বর্ণপদক নিশ্চিত করেন সৌরভ। রণিত ও সৌরভ সোমবার ভোরে দলের সঙ্গে যোগ দেন। ১০ তারিখ রাতে জার্মান থেকে দিল্লি ফেরেন তাঁরা, তারপর সেখান থেকে উত্তরাখণ্ড। এরপরেও খেলতে নেমে এমন দাপট! সত্যিই তা প্রশংসার দাবি রাখে।

জয়ের পর সৌরভ বলেন, 'এই একটা জয় সব ক্লান্তি দূর করে দিয়েছে। আমরা পশ্চিমবঙ্গের হয়ে সেভাবে খেলার সুযোগ পাই না। রাজ্যকে চ্যাম্পিয়ন করার অনুভূতিটা দারুন। গতবার একটুর জন্য সোনা হাতছাড়া হয়েছিল সেই আক্ষেপটা মিটে গেল।'

অন্যদিকে ছেলেদের আগেই সোনা নিশ্চিত করেছিল মেয়েরা। প্রথম সিঙ্গলসে সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় মহারাষ্ট্রের স্বস্তিকা ঘোষকে পরাজিত করেন। এরপর ঐহিকা মুখোপাধ্যায় মহারাষ্ট্রের দিয়া পরাগ চিতালের কাছে পরাজিত হন। তৃতীয় সিঙ্গলসে পয়মন্ত্রী বৈশ্য পশ্চিমবঙ্গ দলকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন। ফিরতি সিঙ্গলসে স্বস্তিকাকে হারিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সোনা জয় নিশ্চিত করেন ঐহিকা।

টিম কম্বিনেশনের কারণে ফাইনালে ছিলেন না মৌমা দাস। তিনি বলেন, 'জাতীয় গেমসে আমরাই সেরা দল। সিনিয়র, জুনিয়র মিলিয়ে অসাধারণ কম্বিনেশন আমাদের। দলের প্রত্যেকেই দাপট দেখিয়েছে। এ রাজ্যের প্যাডলাররাই যে সেরা সোনা জয়ের মাধ্যমে সেটাই প্রমাণিত হলো। ফাইনালে প্রতিপক্ষ হিসেবে মহারাষ্ট্র শক্তিশালী ছিল। লড়াইটা সহজ ছিল না।' □

# জন্মদিন

খুব মিষ্টি মেয়ে আরোহী। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। চোদ্দ বছর বয়স। বড়ো আদরের মেয়ে। তাই বাবা-মা ওর নাম রেখেছে আরোহী— মহাদেবের কন্যা। খুব ভালো মেয়ে সে। খুব মেধাবী। পড়াশোনায় খুব মনোযোগ তার। তার আর কোনো ভাই-বোন নেই। তাই খেলার সাথীও নেই। ছোটো থেকেই একা সে।

স্কুলে অবশ্য চারজন ভালো বন্ধু ছিল বটে কিন্তু ক্লাস এইটে উঠেই তারা অন্য স্কুলে ভর্তি হয়েছে। সেই চার বন্ধুর মধ্যে শুধু একজনের সঙ্গে ফোনে কথা হয় মাঝে মধ্যে। বাকিদের ফোন নম্বর সে জানে না। ঠিকানাও জানে না যে চিঠি লিখবে।

এখন আরোহী শুধু পড়াশোনা নিয়েই থাকে। স্কুলে যেতে একদম ভালো লাগে না। সারাদিন মনমরা হয়ে বাড়িতেই বসে থাকে।

নতুন শ্রেণী শুরু হওয়ার কিছুদিন পরে আরোহী দেখল, তার বাবা-মা ব্যাগপত্র গোছাতে ব্যস্ত। জানতে চাইলে মা একটু হেসে বললেন, তারা সবাই মিলে বেড়াতে যাবে। একথা শুনে একটু হলেও আরোহীর মন ভালো হলো।

পাঁচ-ছ'দিন পরেই সকালবেলা ট্রেনে চেপে রওনা হলো তারা। কোথায় যাচ্ছে আরোহী কিছুই জানে না। গন্তব্যে পৌঁছাতে রাত হয়ে গেল। আরোহী দেখল তাদের থাকার জন্য কোনো হোটেলে ব্যবস্থা করা হয়নি। একটা সুন্দর বড়ো বাংলো ঠিক করা হয়েছে। কিন্তু চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। খুব মন খারাপ হলো আরোহীর।

সঙ্গে আনা রাতের খাবার খেয়ে মন খারাপ নিয়েই শুয়ে পড়ল আরোহী। পরের দিন খুব সকালে ঘুম ভাঙল আরোহীর। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখে সে তো অবাক হয়ে গেল। চার দিকে বড়ো বড়ো

পাহাড়। তার মাঝখানে তাদের ছবির মতো বাংলো। সে দৌড়ে বাংলোর বাইরে এল। চারদিকে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য দেখে আনন্দে তার মন ভরে উঠল।

আরোহীর এই প্রথম পাহাড় দেখা। প্রকৃতি যে এত সুন্দর হতে পারে তা তার কল্পনার মধ্যে ছিল না। একেবারে সামনের পাহাড়টিকে তার খুব ভালো লাগল। মনে হলো ওটা যেন জীবন্ত। আরোহী মনে মনে পাহাড়টাকে ভালোবেসে ফেলল। মনে হলো ওটা যেন তার প্রিয় বন্ধু। একটু পরে তার ভয় হলো, এই পাহাড়ও একদিন তাকে ছেড়ে চলে যাবে না তো!

বাংলোয় ফিরে এসে মাকে জিজ্ঞেস করল আরোহী, কবে তারা বাড়ি ফিরে যাবে? মায়ের মুখ থেকে অবাক করা উত্তর শুনে আরোহী তো বিশ্বাস করতেই পারছিল না যে এটা কি সত্যি! মা বললেন, এখন থেকে এই বাংলোই তাদের বাড়ি। এখানেই থেকে যাবে তারা। বাবার কাজের সূত্রে এখানেই লাস্ট পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। আর চাকরি জীবনে সততার জন্য এই বাংলোটিও দিয়েছে।

আনন্দে আরোহীর চোখে জল এসে গেল। দৌড়ে সে বাংলোর বাইরে পাহাড়টির সামনে এসে দাঁড়ালো। মনটি প্রজাপতির মতো চঞ্চল হয়ে উঠল। তার মনে হলো সামনের পাহাড়টি তাকে যেন কিছু বলছে। মন প্রাণ স্থির করে আরোহী তা শোনার চেষ্টা করল। শুনতে পাচ্ছে সে। পাহাড়টি বলছে— "শুভ জন্মদিন বন্ধু, শুভ জন্মদিন আরোহী। সব বন্ধু তোমাকে ছেড়ে গেছে কিন্তু আমি তোমাকে কোনোদিন ছেড়ে যাবো না। যেতে চাইলেও পারবো না। দেখো, মাটি-মা আমাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। তোমার কোনো ভয় নেই, আমি সারা জীবন তোমার পাশে থাকবো বন্ধু।"

পাহাড়ের কথা শুনে হেসে ফেলল আরোহী। প্রাণ ভরে হাসি। অনেকদিন পর এমন প্রাণ খুলে হাসলো আরোহী। সত্যিই আজ ওর নবজন্ম হলো। আজ আরোহীর জন্মদিন।

**রূপসা রায়,** নবম শ্রেণী, লেক টাউন, কলকাতা-৪৮।

## জাতীয় উদ্যান

# এনটাঙ্কি

এনটাঙ্কি ন্যাশনাল পার্ক নাগাল্যান্ড রাজ্যের পেরেন জেলায় অবস্থিত। ইন্টাঙ্কি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের নামে এই উদ্যানের নামকরণ করা হয়েছে। এটি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় চিরহরিৎ অরণ্য উদ্যান। এই উদ্যানের মোট আয়তন ২০২.০২ বর্গকিলোমিটার। ১৯৯৩ সালে জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা হয়েছে। বাঁশের বন এবং বিস্তৃত তৃণভূমি এই উদ্যানের বৈশিষ্ট্য। উদ্যানের ভেতরে কয়েকটি পাহাড় রয়েছে। পাহাড় থেকে কয়েকটি ঝরনা নেমে এসেছে। কয়েকটি নদীও এই উদ্যানের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সোনালি লেঙ্গুর, হুলক গিবন, পাম সিভেট, বাঘ, স্লথ, বন্য কুকুর, উড়ন্ত কাঠবেড়লি, কালো সারস, মনিটর টিকটিকি, পাইথন প্রভৃতি। এই উদ্যান নাগাল্যান্ডের জনপ্রিয় পর্যটক আকর্ষণের কেন্দ্র।

## এসো সংস্কৃত শিখি-৫৬

**পুংলিঙ্গে**

**ভবান- ভবন্তঃ** (তুমি– তোমরা)
**ভবান্ বালকঃ** (তুমি বালক)
**ভবন্তঃ বালকাঃ** (তোমরা বালক)
**অভ্যাসং কুর্মঃ--**
ভবান্ কঃ- ভবন্ত কে ?
(তুমি কে? – তোমরা কে?)
ভবান্ ছাত্রঃ - ভবন্ত ছাত্রাঃ।
ভবান্ গায়কঃ - ভবন্ত গায়কাঃ।
ভবান্ সৈনিকঃ - ভবন্ত সৈনিকাঃ।
ভবান্ নাবিকঃ - ভবন্ত নাবিকঃ।
**প্রয়োগং কুর্মঃ**
ভক্তঃ, দরিদ্রঃ, মূর্খঃ, খল্বাটঃ, শিষ্যঃ, নায়কাঃ, যজমানঃ, মহারাজঃ, চালকঃ, অর্চকঃ, পাচকঃ, চতুরঃ, দাসঃ, প্রিয়ঃ, স্থূলঃ, কৃশঃ, বামনঃ, জ্যেষ্ঠঃ, কনিষ্ঠঃ, সহোদরঃ, অগ্রজঃ, জনকঃ।

## ভালো কথা

### ভাগের আনন্দ

সেদিন স্কুল ছুটি হবার সময়ে আমার খুব খিদে পেয়েছিল। সেকথা বলতে মা আমাকে দুটো চকোলেট বার কিনে দিয়েছিলেন। বাসে উঠে আমি চকোলেট খেতে শুরু করলাম। একটু পরেই দেখি আমার সামনেই মায়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে একটি বাচ্চা। আমার হাতের চকোলেটের দিকে ওর লোভনীয় দৃষ্টি। আমার একটা চকোলেট ওকে দিতে ইচ্ছা করছিল কিন্তু মায়ের ভয়ে দিতে পারছিলাম না। একটু পরেই দেখি মা বসে বসে ঘুমুচ্ছেন। সেই সুযোগে আমি বাচ্চাটির হাতে চকোলেটের অন্য বারটি দিলাম। বাচ্চাটি মনের আনন্দে খেতে শুরু করল। আমি মনে মনে ভাবছিলাম ভাগ্যিস মা দেখতে পায়নি। বাড়িতে এসে সন্ধ্যেবেলা মা আমাকে আদর করে বললেন, ভাগ করে খেলে আনন্দ বেশি হয়। আমি বললাম, মা তুমি দেখতে পেয়েছ? মা বললেন, আমি ইচ্ছে করেই চোখ বন্ধ করে ছিলাম।

**কেয়া সান্যাল,** পঞ্চমশ্রেণী, চাকদহ, নদীয়া।

*তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।*

## শব্দের খেলা

| *লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে* | *সঠিক ভাবে সাজাতে হবে* |
|---|---|
| (১) ড় ন গু লে | (১) র রা ন না ণ য় |
| (২) প ব গু ঞ্চ | (২) ন না য় রা ম ভি |

**১০ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর**
(১) মধুসূদন (২) অমিত্রাক্ষর

**১০ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর**
(১) অক্ষয়তৃতীয়া (২) অকূলপাথার

**উত্তরদাতার নাম**
(১) বর্ণিনী সরকার, বি এস রোড, মালদা। (২) অনিশ দাস, গল্ফগ্রিন, যাদবপুর নগর, কলকাতা (৩) সপ্তর্ষি রায়, লেক টাউন, কল- ৪৮। (৪) পুলক দে, নামোপাড়া, পুরুলিয়া।

*সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।*

**উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়**

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
*ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।*
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

# যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

# নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

# মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

## কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

**DRS INVESTMENT** 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

**NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond**

# মহাকুম্ভ : হিন্দু শক্তি ও সংস্কৃতির অবিরল ধারা

## এবারের মহাকুম্ভ মেলাকে বলা যেতে পারে সনাতনী পরম্পরার মহাসঙ্গম, হিন্দু আত্মার এবং হিন্দু আস্থার মহাসঙ্গম, হিন্দু একাত্মতার মহাসঙ্গম।

**দুর্গাপদ ঘোষ**

প্রয়াগরাজ ঃ আয়োজিত হলো এই শতাব্দীর প্রথম ও শেষ পূর্ণমহাকুম্ভ মেলা। ঘটল দুই মহাশক্তির মহামিলন। মহাজাগতিক যোগের অমৃত কুম্ভ এবং মানবতাবাদী হিন্দু শক্তির মহাসঙ্গম ঘটল প্রয়াগরাজের পূর্ণমহাকুম্ভে। গত ১৩ জানুয়ারি পৌষ পূর্ণিমার দিন থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি মহাশিবরাত্রি পর্যন্ত ৪৫ দিনের এই মহাকুম্ভের প্রথম দিনই ভোর সাড়ে ৩টে থেকে বিকেল সাড়ে ৩টে পর্যন্ত পুণ্যস্নান করেছেন ১ কোটি ৬৫ লক্ষ পুণ্যার্থী। এর বাইরে আরও কমপক্ষে ৫০ লক্ষ মানুষ এসেছেন যারা মেলা পরিসরে ঘুরেছেন কিন্তু স্নান করেননি। এই ধরনের পর্যটকরা ৪৫ দিনের প্রত্যেক দিনই লাখে লাখে মহাকুম্ভমেলা পরিদর্শণ করেছেন। মুখ্য তথা রাজসী বা অমৃতস্নানের দিনগুলো ছিল ১৪ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তি, ২৯ জানুয়ারি মৌনী অমাবস্যা এবং ৩ ফেব্রুয়ারি বসন্ত পঞ্চমী তিথি। এবার কুম্ভযোগের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দিন ছিল মৌনী অমাবস্যা। মহাবিশ্বের সৌরমণ্ডলে এ এক বিস্ময়কর মহাযোগ। এদিন শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন গ্রহ এবং সূর্য ও চন্দ্র এক রেখায় অবস্থান করে। প্রতি ১৪৪ বছর অন্তর এক সঠিক ক্ষণে ঘটে থাকে এই মহাযোগ। সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থান মকররাশিতে, দেবগুরু বৃহস্পতির অবস্থান বৃষরাশিতে। মহাজাগতিক এই মহাযোগে এবার ত্রিবেণী সঙ্গমে ৮ কোটির বেশি মানুষ পুণ্যস্নান করে কুম্ভমেলার ইতিহাসে নজির সৃষ্টি করেছেন। ৩ ফেব্রুয়ারি শ্রীপঞ্চমীর দিন পুণ্যস্নান করেছেন প্রায় ৩ কোটি ভক্ত। এই তিন দিন শাহী স্নান বা অমৃত স্নান ছাড়াও আরও যে ৩ দিন অর্থাৎ ১৩ জানুয়ারি, ১২ ফেব্রুয়ারি মাঘী পূর্ণিমা এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি মহাশিবরাত্রির দিনও বিপুল সংখ্যক তীর্থযাত্রী পুণ্যস্নান করেছেন। সব মিলিয়ে ৪০ কোটি মানুষ কুম্ভস্নান করতে পারেন বলে আগাম অনুমান করা হয়েছিল। কিন্তু ৫ ফেব্রুয়ারি যেদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কুম্ভস্নান করেন সেদিন পর্যন্ত ৩৯ কোটি ভক্তের পুণ্যস্নান সম্পন্ন হয়ে যায়। কয়েকটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যাওয়া সত্বেও ওই অনুমানকে পিছনে ফেলে পুণ্যস্নান করেছেন অন্তত ৪৫ কোটি মানুষ। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, ঘটনাচক্রে এখন থেকে ৯৫ বছর আগে ১৯৩০ সালেও এবারের মতো একই তারিখে এবং একই বারগুলোতে একই তিথি পড়েছিল। সেবারও ১৪ জানুয়ারি, মঙ্গলবার ছিল মকর সংক্রান্তি, ২৯ জানুয়ারি বুধবার ছিল মৌনী অমাবস্যা এবং ৩ ফেব্রুয়ারি সোমবার ছিল শ্রীপঞ্চমী। সেবার ছিল পূর্ণকুম্ভ। এবারের মতো একই তারিখ এবং বারগুলোতে শাহী স্নান হয়েছিল।

এবার মহাকুম্ভমেলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হিন্দুকুম্ভের বিশ্বরূপ দেখে সকলেই বুঝতে পেরেছিলেন যে এখন বিশ্ব জুড়ে হিন্দু জাগরণের যে রূপ ফুটে উঠতে দেখা যাচ্ছে তাতে এই মহাকুম্ভে ৪০ ছাপিয়ে গিয়ে ৫০ কোটির বেশি হিন্দুর মহামিলন ঘটতে চলেছে। বাস্তবে প্রায় সেটাই ঘটেছে। কেবল সাধু সন্তদেরই আগমন ঘটেছে সওয়া এক কোটিরও বেশি। তাঁরা দেড় মাস ধরে প্রতি দিনই হিন্দু ঐক্যের ডাক দিয়েছেন। এতে গোটা হিন্দু সমাজ যেমন নবজাগরণের বার্তা পেয়েছে, তেমনি প্রবলভাবে আবেগাপ্লুত হয়েছে। অবগত হয়েছে সনাতনের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পর্কে। কেবল শাহী স্নান কিম্বা পুণ্যস্নান নয়, ১৪ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তির দিন প্রথম অমৃত স্নানের সঙ্গে সঙ্গে বিশাল এলাকাজোড়া মেলা পরিসরে বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন আখড়ায় এবং বিভিন্ন শিবিরে হিন্দুসমাজ এবং ভারত রাষ্ট্রের হিতার্থে শুরু করা হয় সহস্রাধিক হোমযজ্ঞও। সেদিন পুণ্যস্নান করেন প্রায় ৩ কোটি ৫০ লক্ষ ভক্ত। কীসের টানে, মহাসমারোহে হিন্দুদের এহেন মহাসঙ্গম, বিশ্ববাসী তার কোনো কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছেন না। হিন্দু উত্থানের এই মহীরূপ দেখে সবাই যারপরনাই বিস্মিত, বিহ্বল, স্তম্ভিত। আর পুণ্যস্নানের পাশাপাশি মেলাক্ষেত্র জুড়ে যে সমস্ত দাবি উঠেছে, ধ্বনি উঠেছে এবং পোস্টারাদি পড়েছে তা বিশেষ এক বিশেষ সম্প্রদায়কে তোষণকারী, তথাকথিত সেকুলারবাদীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিয়েছে। ক্ষমতাসর্বস্ব রাজনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে রীতিমতো দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছেন তাঁরা। আর কিছু খুঁজে না পেয়ে মহাকুম্ভের ব্যবস্থাপনা নিয়ে তাঁরা যেভাবে মুখর হয়েছেন তা দেখেশুনে মনে হচ্ছে বুঝি-বা তাঁদের গদি দখলের রাজনীতির চাষের ক্ষেতের হালের বলদ হারিয়ে যেতে বসেছে। দীর্ঘদিন যাবৎ এদের নিরন্তর হিন্দু বিরোধিতা বরদাস্ত করতে করতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া শান্তিপ্রিয় হিন্দু সমাজের অন্তঃস্থল থেকে এবার যেন ভিসুভিয়াসের মতো মহাজাগরণ ঘটার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছেন সবাই। এযাবৎকালের কুম্ভমেলা সেই প্রথাগত অধ্যাত্মমেলা। কিন্তু এই মহাকুম্ভমেলা সেই প্রথাগত অধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সঙ্গে যেন আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত সিংহের কেশর ফুলিয়ে

**এই মহাকুম্ভ মেলা কেবল এই শতাব্দীর মহা মানবমেলা কিম্বা গৈরিকের বর্ণচ্ছটায় প্লাবিত অধ্যাত্মমেলাই নয়, হিন্দুহিত, শক্তিশালী হিন্দু-ভারত, সনাতন ঐক্য তথা হিন্দু জাগরণেরও মহামেলা।**

ফঃ ৬

গর্জে ওঠার মতো তেজোদীপ্ত গর্জনেও রূপান্তরিত হয়েছে। তার রুদ্ররূপ এতটাই প্রকট হয়েছে যে মেলার মধ্যে আখড়া থেকেই একজন নাগা সন্ন্যাসী হুংকার দিয়ে বলেছেন যে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়লে বাংলাদেশ দখল করতে সময় লাগবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সশস্ত্র নাগা সাধুদের সংখ্যা এখন সাড়ে ৫ লক্ষেরও বেশি। এবং দিনে দিনে নাগা সন্ন্যাসে দীক্ষা নেবার জন্য হাজার হাজার যুবক এগিয়ে আসছেন। আর সব মিলিয়ে বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনীর সদস্য সংখ্যা বড়োজোর দেড় লক্ষ।

এবার শাহীস্নানগুলোসহ মোট ৬টি মুখ্যস্নান তো বটেই অন্য সময়ও ধর্মীয় প্রবচনের পাশাপাশি আখড়ায় আখড়ায়, শিবিরে শিবিরে প্রায় প্রতিদিনই 'হর হর মহাদেব'-এর সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে ধ্বনি উঠেছে 'জয় শ্রীরাম'-ও। বন্দেমাতরম্-এর পর যে ধ্বনি গত ৪ দশক ধরে হিন্দু জাগরণের মহামন্ত্রের রূপ নিয়েছে। মহাকুম্ভে এইসব ধ্বনির সঙ্গে সরাসরি হিন্দু ঐক্য তথা হিন্দু জাগরণের আহ্বানসূচক নানা ধ্বনিতে গমগম করেছে ৪ হাজার হেক্টর অর্থাৎ ৪ কোটি বর্গমিটার এলাকা জোড়া মেলা পরিসর। প্রতিদিন 'হিন্দু হিন্দু এক হও', ইত্যাদি ধ্বনি যেমন উঠেছে, তেমনি 'সনাতন সাত্ত্বিক পর কায়র নহী' ধ্বনি দিয়ে গৈরিকে আবৃত সাধুসন্তরাও বুঝিয়ে দিয়েছেন শুধুমাত্র ধর্মাচার-অধ্যাত্মিকতার মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকার দিন শেষ হয়ে গেছে। বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে হিন্দুরা পরম্পরাগতভাবে পরমত সহিষ্ণু ও সাত্ত্বিক কিন্তু কাপুরুষ নয়। 'ডরেঙ্গে তো মরেঙ্গে'—ভয় পেলে মরবো, পোস্টার লাগিয়ে এবং মিছিল করে সোচ্চার হয়ে হিন্দুদের এবার ভয়ডর ছেড়ে সাহসের সঙ্গে একতাবদ্ধ হবার আহ্বান জানাতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হননি প্রমুখ ধর্মাচার্যরাও। যা এতদিন কেউ কল্পনায়ও করতে পারেননি। জগদ্গুরু রামানন্দাচার্য, জগদ্গুরু নরেন্দ্রাচার্য মহারাজের ছাপানো শেষোক্ত এই পোস্টার মহাকুম্ভে এক কিলোমিটার এলাকাজুড়ে যেন পথপ্রদর্শক মশালের আলোর মতো গোটা হিন্দু সমাজকে আলো দেখিয়েছে। এই পোস্টারের সমালোচনা করে যাঁরা রাজনীতির বেসাতি করার চেষ্টা করেছেন তাঁদের মুখের মতো জবাব দিয়েছেন গৈরিক বসনধারী সন্ন্যাসীরা। অনেক পীঠাধীশ্বর এবং অন্যান্য ধর্মাচার্যদের স্পষ্ট ভাষায় বক্তব্য, সহনশীল অর্থ সমস্ত রকমের অত্যাচার অনাচার সহ্য করে আবেশ জড়ানো ভালোমানুষি দুর্বলতার দ্যোতক। ওই পোস্টারের সমর্থন করে একাধিক ধর্মাচার্য বলেছেন যে জগদ্গুরু নরেন্দ্রাচার্য যা করেছেন তা ঠিকই করেছেন। তাঁদেরও একই বক্তব্য, সনাতন হিন্দুত্ব রক্ষা এবং সমস্ত হিন্দুদের নির্ভয়ে একতাবদ্ধ ও শক্তিশালী হবার ডাক হিন্দুরা দেবে না তো আর কে দেবে? কুম্ভমেলা হলো হিন্দুদের বৃহত্তম মিলন মেলা। হিন্দুদের সামনে এগিয়ে আসতে থাকা কোনো বিপদ সম্পর্কে তাদের সতর্ক করে সাবধান থাকা এবং ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান এখানে জানানো হবে না তো আর কোথায় হবে! কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে ধর্ম রক্ষার্থে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্র ধারণ করেছিলেন। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র উদয়নিধির নাম না করে তার মতো যারা সনাতনকে সমূলে উপড়ে ফেলার চেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁদের উদ্দেশে একরকম হুঁশিয়ারির সুরে সতর্ক করে দিয়েছে 'যুব চেতনা' নামের সংগঠন। ১৮ জানুয়ারি মহাকুম্ভ মেলায় এই সংস্থা 'বিশ্বগুরু ভারত' শীর্ষক এক সমাবেশের আয়োজন করে। তার উদ্বোধন করে স্বামী অভিষেকানন্দ ব্রহ্মচারী বলেন, সনাতনী হিন্দুরা লড়াই করে রামজন্মভূমি মন্দির পুনর্নির্মাণ করেছে। এখন আমরা কাশী বিশ্বনাথ এবং মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানের সম্পূর্ণ মুক্তি চাইছি। এখন আর সনাতনের সঙ্গে টক্কর দেবার ক্ষমতা কার নেই বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন তিনি। তার পর পরই ২১ জানুয়ারি সারা ভারতে ধর্মান্তরণ বন্ধের ডাক দেন অখিল ভারতীয় আখড়া পরিষদের শীর্ষকর্তা মহন্ত রবীন্দ্র পুরী মহারাজ। তাঁর মতে ইসলামে ধর্মান্তরণে মদত দিচ্ছে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই। পাকিস্তানের জবরদখলে থাকা কাশ্মীরে অংশটিকে পুনরায় ভারতভুক্ত করা এবং একই সঙ্গে পুনরায় অখণ্ড ভারত গড়ার জন্যও সরব হয়েছেন অনেক হিন্দু ধর্মাচার্য। মহাকুম্ভে সেক্টর ৮-এ একজন সন্ত তাঁর শিবিরে সবার যাতে নজরে পড়ে এরকম জায়গায় তেজস যুদ্ধবিমানের একটা মডেল রেখে কার্যত বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানকে ভারতের বিমান বাহিনীর শক্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্র পুরী মহারাজের স্বরে স্বর মিলিয়ে ধর্মান্তরণ বন্ধ করা ছাড়াও হিন্দুদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ডাক দিয়েছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় মার্গদর্শক মণ্ডলী। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক শ্রীমোহনরাও ভাগবত সম্প্রতি

প্রত্যেক হিন্দুর অন্তত ৩টে করে সন্তান হওয়া দরকার বলে যে মত প্রকাশ করেন মহাকুম্ভে গত ২৪ জানুয়ারির বৈঠকে সন্ত সমাজের অন্তত ১৫টি সংস্থাকে নিয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় মার্গদর্শকমণ্ডলী বস্তুত তাকেই সমর্থন করে মান্যতা দিয়েছেন। হিন্দুর সংখ্যা ক্রমাগত কমে যেতে থাকায় এবং অন্যদের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটায় সন্তমণ্ডলী গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এই বৈঠকে। এছাড়া হিন্দু ধর্মস্থানগুলির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনভার সরকারের কবলমুক্ত করে মন্দির ট্রাস্টিদের হাতে তুলে দেবার দাবিও করা হয়েছে। কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার ওয়াকফ বোর্ডের অনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের জন্য ওয়াকফ আইন সংশোধনে যে পদক্ষেপ নিয়েছে তাকে সোচ্চারে সমর্থন করে মার্গদর্শকমণ্ডলী সমস্ত সাংসদকে সমর্থন করার আর্জি জানিয়েছেন। পাশাপাশি অযোধ্যার রামজন্মভূমি মন্দিরের পর অন্তত আরও দুটো ধর্মস্থান কাশী ও শ্রীকৃষ্ণজন্মভূমি মথুরায় যথাক্রমে জ্ঞানবাপী মসজিদ এবং ইদগাহকেও মুক্ত করে হিন্দু ধর্মস্থানে পুনরাবর্তিত করার দাবিও ফের তোলা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে সন্তমণ্ডলী উল্লেখিত তিনটি ধর্মস্থান মুক্ত করার দাবি করেন ১৯৮৪ সালে অনুষ্ঠিত ধর্মসংসদের বৈঠকে। সেই থেকে দেশের সন্তমণ্ডলী, হিন্দু সমাজ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ নিরন্তর এই দাবি করে আসছে। মহাকুম্ভের আগে ১৯৮৯ সালে ধর্মসংসদের যে শেষ বৈঠক হয়েছিল সেখানেও এই দাবি রেখেছিলেন মার্গদর্শকমণ্ডলী। মহাকুম্ভমেলায় এদিনের বৈঠকে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য বাসুদেবানন্দ সরস্বতী, নাগাদের জুনা আখড়ার পীঠাধীশ্বর আচার্য স্বামী অবধেশানন্দ গিরি, স্বামী চিদানন্দ মুনি, নির্মোহী আখড়ার মহন্ত রাজেন্দ্র দাস, অখিল ভারতীয় আখড়া পরিষদের অধ্যক্ষ মহন্ত রবীন্দ্র পুরী। সন্তদের নিয়ে গঠিত মার্গদর্শক মণ্ডলী ছাড়াও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ হিন্দুসমাজকে আরও সংগঠিত ও শক্তিশালী করার জন্য সংস্থার সর্বভারতীয় কর্মী সম্মেলন, মাতা-ভগিনী সম্মেলন, গোরক্ষা ও গোসংবর্ধিণী সম্মেলনাদিও করেছে। করেছে যুবসন্ত সম্মেলন, সাধ্বীসন্ত সম্মেলনও।

মহাকুম্ভমেলা প্রাঙ্গণে সন্ত সমাজের সবচাইতে প্রভাবশালী এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে ২৭ জানুয়ারি। সনাতন হিন্দু ধর্মাচার্যদের প্রায় সমস্ত শীর্ষস্থানীয়কে নিয়ে বসে সনাতন হিন্দু ধর্ম-সংসদ। হিন্দুত্ব বিষয়ক প্রায় সমস্ত কিছুর প্রস্তাবক ও নিয়ন্ত্রক হলো এই ধর্ম সংসদ। ইতিপূর্বে ধর্মসংসদে যে সমস্ত প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তার প্রায় সমস্ত কিছুই কার্যে রূপায়িত হয়েছে। এজন্য সন্ত সমাজ তাঁদের সিদ্ধান্তে হিমালয় পর্বতের মতো শুধু অটল থেকেছেন তাই নয় মহাসমুদ্রের প্রবল ঢেউয়ের মতো নিরন্তর আন্দোলনেও ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। এদিনের বৈঠকের রূপ ও মানসিক দৃঢ়তা দেখে হিন্দু সমাজের যেন নবজাগরণ ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে। কেউ কেউ ধর্মসংসদের এই বৈঠক এবং সন্তদের দাবি ও প্রস্তাবাদিকে সনাতন শঙ্খনাদ বলে অভিহিত করেছেন। সংসদে একাধিক বিষয় নিয়ে প্রস্তাব ও আলোচনা হলে স্বনামধন্য কথাবাচক দেওকীনন্দন ঠাকুরের বক্তব্য অনুযায়ী এবারের এই ধর্মসংসদ বসে মুখ্যত সনাতন হিন্দু বোর্ড গঠনের জন্য। ধর্মসংসদ এই বোর্ড গঠনের জন্য যে সনাতন বোর্ড অ্যাক্ট (আইন) রচনার প্রস্তাব করেছে তাঁদের দ্বারা একটি ট্রাইবুনাল গঠনের কথা বলা হয়েছে। যার সদস্যরা হবেন জগদ্গুরু শঙ্করাচার্যদের দ্বারা মনোনীত। দেশের সমস্ত

মঠ-মন্দিরের সম্পত্তি এবং হিন্দু ধর্মস্থানগুলির অর্থ কীভাবে এবং কোন কোন শুভকাজে ব্যয় করা হবে তা দেখাশোনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকবে এই ট্রাইবুনালের। ধর্মসংসদে আরও যে সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে একটি হলো ৪ জন শঙ্করাচার্যর পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত হবে সর্বভারতীয় সনাতন বোর্ড। ৪ জন জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য, সনাতনী আখড়াগুলির প্রমুখ ধর্মাচার্য এবং একজন কথাবাচক অথবা প্রমুখ সন্ন্যাসীসহ মোট ১১ জন সদস্যকে নিয়ে এই বোর্ড গঠন করা হবে। উল্লেখিত ট্রাইব্যুনাল যে সমস্ত হিন্দু ধর্মস্থল এবং তাদের এক্তিয়ারভুক্ত জমি অন্যদের বিশেষ করে ওয়াকফ বোর্ডের জবরদখলে রয়েছে সেগুলোকে মুক্ত করা এবং অসাংবিধানিকভাবে অন্যদের দখলে থাকা সমস্ত হিন্দু সম্পত্তি দখলমুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে উল্লেখিত এই ট্রাইব্যুনাল। হিন্দুদের অন্য ধর্মমতে পরিবর্তন রোধ করার জন্যও কার্যকরী ব্যবস্থা নেবার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে এদিনের ধর্ম সংসদে। একটি খসড়া প্রস্তাবে বলা হয়েছে অযোধ্যার শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়ায় মথুরার শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি এবং কাশীর আদি বিশ্বেশ্বর মন্দির পুনরুদ্ধার করা হবে।

ধর্মসংসদে সনাতন হিন্দু বোর্ড গঠনের দাবি প্রস্তাব রাখেন দেওকীনন্দন ঠাকুর। পাশাপাশি ওয়াকফ বোর্ডের অস্তিত্ব এবং তাদের বেআইনি তথা গাজোয়ারি তৎপরতা বিলোপ করার ওপর জোর দেন অখিল ভারতীয় আখড়া পরিষদের অধ্যক্ষ শ্রীমন্ত রবীন্দ্র পুরী। ওয়াকফ বোর্ডের বিরুদ্ধে প্রায় খড়্গহস্ত হয়ে হিন্দু সমাজকে সতর্ক করে দিয়ে দেওকীনন্দন ঠাকুর বলেন, ওয়াকফ বোর্ড তলে তলে ভারত দখল করার ফন্দি চালাচ্ছে। তারা যে কোনোদিন ভারত দখল করে নিতে পারে। মঠ-মন্দিরগুলো ওয়াকফ বোর্ডের দখলমুক্ত হোক এই দাবি করে তিনি বলেন, সনাতন হিন্দুত্ব রক্ষার জন্যই ধর্মসংসদকে সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশে হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হচ্ছে। নির্বিচারে হিন্দুদের হত্যা করা হচ্ছে। এখন আর চুপ করে থাকলে চলবে না। প্রতিবাদে মুখর না হলে হিন্দু নির্যাতন বন্ধ হবে না।

ধর্মসংসদে সনাতন বোর্ড গঠনসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা তথা বিচার মন্থনকে সমুদ্র মন্থনের সঙ্গে তুলনা করেছেন শ্রীমন্ত রবীন্দ্র পুরী। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে কথাবাচক শ্রী ঠাকুর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে সমস্ত সাধুসন্তদের 'যজমান' বলে আখ্যায়িত করেন। বলেন, মহাকুম্ভ নামক এই মহাযজ্ঞে শ্রীমোদী ও যোগীজী 'সনাতন বোর্ড'কে আইনি স্বীকৃতি দিয়ে যজমান হিসাবে 'দক্ষিণা' প্রদান করুন। সনাতন বোর্ড গঠিত হলে তা হিন্দুদের 'ধর্মীয় স্বাধীনতা' লাভ হবে বলেও মত প্রকাশ করেন এই কথাবাচক। প্রয়াগরাজের এই মহাকুম্ভে হিন্দু জাগরণ, হিন্দু গর্জন, সনাতন বোর্ডের প্রস্তাব ওয়াকফ বোর্ড বিলোপের দাবি, ধর্মান্তরণ বন্ধ, বাংলাদেশে হিন্দু হত্যা ও মন্দির ধ্বংসের প্রসঙ্গ উত্থাপন, এমনকী ভারতকে এবার 'হিন্দুরাষ্ট্র' ঘোষণার দাবি পর্যন্ত উঠতে বাকি থাকেনি। কেবল তাই নয়, জগদ্গুরু স্বামী রামভদ্রাচার্যের মতো বারবার 'হিন্দুরাষ্ট্র'-এর দাবিতে মুখর বাগেশ্বর বাবাও মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান করে 'অখণ্ড ভারত'-এর দাবি তুলেছেন। মহাকুম্ভমেলা যাতে ব্যাপক ও সফল না হতে পারে সেজন্য হিন্দু বিরোধীরা গভীর চক্রান্ত করছেন বলেও অভিযোগ করেছেন এই বাগেশ্বর।

মৌনী অমাবস্যা শুরু হতে না হতে রাত দুটো নাগাদ প্রায় কোটি তীর্থযাত্রী সঙ্গমে পুণ্যস্নানের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ায় ব্যারিকেড ভেঙে গিয়ে বিপর্যয় ঘটে। পদপিষ্ট হয়ে অন্তত ৩০ জনের মৃত্যু ঘটে। আরও প্রায় ৪০-৪৫ জন গুরুতর আহত হন। উল্লেখ্য, এই নিয়ে স্বাধীনতার পর বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত কুম্ভমেলায় ৫ম দুর্ঘটনা তথা পদপিষ্ট হয়ে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। তবে এই ঘটনা যেমন খুব অল্প সময়ের মধ্যে স্বাভাবিক হয়েছে তেমনি নাগা আখড়াগুলোসহ বিভিন্ন আশ্রমের ধর্মাচার্য এবং অন্যান্য সন্তরা অমৃত স্নানও করেছেন। সাধারণ ভক্ত ও পুণ্যার্থীরাও লাখে লাখে, কোটিতে কোটিতে যিনি যে ঘাটে পেরেছেন ডুব দিয়েছেন। তার পরদিনও ২ কোটির বেশি মানুষ পুণ্যস্নান করেছেন। প্রশাসন যেমন তৎপরতার সঙ্গে সবকিছু সামাল দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করেছে, আখাড়াগুলোও সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেনি। দুর্ঘটনার পরও না পুণ্যস্নানে ভাটার টান ধরেছে না এতটুকুও ম্লান হয়েছে কুম্ভমেলার পরম্পরাগত ঐতিহ্য।

কেবল সনাতন হিন্দু সমাজই নয়, কুম্ভমেলা সারা বিশ্বের যে কোনো সমাবেশের মধ্যে বৃহত্তম মানবমেলা। সর্বত্যাগী সাধুসন্ত থেকে শুরু করে পুণ্যস্নানার্থী এবং সাধারণ তীর্থযাত্রী এই মেলায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। কারণ এই সময় প্রয়াগরাজের এই পুণ্যভূমি দেবলোকে রূপান্তরিত হয় বলে আপামর হিন্দুর পরম্পরাগত বিশ্বাস। হিন্দুরা মনে করেন যে এই সময় অর্থাৎ অমৃত কুম্ভযোগে এখানে স্বর্গ থেকে সমস্ত দেবতার আগমন ঘটে, অধিষ্ঠান ঘটে। তাছাড়া শ্রীরঙ্গভরপুর ধামের পীঠাধীশ্বর স্বামী নারায়ণাচার্য শাণ্ডিল্য মহারাজের কথা অনুযায়ী প্রয়াগরাজ হলো স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার তপোভূমি। ব্রহ্মা এখানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। সেই যজ্ঞের ব্যবস্থা করেছিলেন গোলোকাধিপতি বিষ্ণু। তাছাড়া পুরাণের ভাষ্য অনুসারে দেব-দানবের সমুদ্র মন্থনে উঠে আসা অমৃত কলসের থেকে কিছুটা অমৃত এখানে পতিত হয়েছিল। তাই এই সময় এখানে স্নান করলে যেমন অমরত্ব লাভ করা যায় তেমনি বারংবার জন্মমৃত্যু থেকে চিরতরে মুক্তি অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। যা মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য। সুতরাং যে স্থানে স্বয়ং ব্রহ্মা তপস্যা করেছেন, যেখানে মহামুনি ভরদ্বাজ আশ্রম গড়ে সঙ্গমে স্নান করতেন, সেখানে সমস্ত দেবতা এসে অলক্ষ্যে অবস্থান করেন সেখানে আসা মানে তো স্বর্গভূমিতে আসা। সে আকর্ষণ কী প্রবল হতে পারে তা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। এহেন মোক্ষভূমিতে আসার জন্য আখড়া, আশ্রম, ডেরা, ঘর-সংসার, সবকিছু থেকে বেরিয়ে ছুটে এসেছেন জটাজুট-রুদ্রাক্ষ শোভিত গৈরিক বসনধারী থেকে শুরু করে কোটি-কোটি সাধারণ গৃহী। এসেছেন ভারতের সমস্ত অঞ্চল, গিরি-গুহা, বন-জঙ্গল, নগর-শহর, গ্রাম-গঞ্জ, সমস্ত জায়গা থেকে। এসেছেন রাশিয়া, আমেরিকা, ইউক্রেন, ইতালি, জাপান, কোরিয়া, আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানসহ বিশ্বের সমস্ত মহাদেশ থেকে। অনাবাসী ভারতীয়রা যেমন এসেছেন তেমনি এসেছেন বহু বিদেশি-বিদেশিনীরাও।

কুম্ভযোগে অমৃতস্নান শুরু হবার অনেক আগে থেকে নিজেদের আশ্রম তথা সাধনক্ষেত্রে ইষ্ট আরাধনায় মগ্ন থাকা সন্তরা শিষ্য ও ভক্তদের নিয়ে দফায় দফায় বর্ণাঢ্য ও রাজকীয় শোভাযাত্রা করে 'ছাউনি প্রবেশ' করেছেন। তাঁদের সেইসব গৈরিক শোভাযাত্রা যুদ্ধ জয় করে রাজা-মহারাজদের রাজপুরীতে ফেরা বিজয় শোভাযাত্রাকেও যেন ম্লান করে দেবার মতো। দু'চোখ ভরে দেখার মতো। তেমনি কাতারে কাতারে চলে আসা পুণ্যার্থীর ঢল। বিশেষ করে বিশ-পঞ্চাশ কী দু' একশো কিলোমিটার দূর থেকে সাধারণ মানুষ যেভাবে ট্রেন, বাস, লরি, টেম্পো, ম্যাটাডোর, অটো, টোটো, ভ্যানগাড়ি এমনকী ট্রাক্টরের ট্রেলারে চড়ে এসেছেন তা এককথায় ভাবা যায় না। আক্ষরিক অর্থেই

আবালবৃদ্ধবনিতা সপরিবারে এমনকী কচি-কাচা পর্যন্ত কোলে-পিঠে, কাঁধে চড়িয়ে, মাথায় করে গ্রাম কে গ্রামের মানুষ যেন সুনামির ঢেউয়ের মতো চলে এসেছেন। ব্যাগপত্র, বোঁচকা বুঁচকি এমনকী বাক্স-প্যাঁটরা পর্যন্ত মাথায় করে দিনরাত হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার ধারে ধারে, আমতলা-জামতলা-বটতলা যিনি যেখানে পেরেছেন সাময়িক আস্তানা গেঁড়েছেন। খোলা আকাশের নীচে রাত কাটিয়েছেন কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে। অনেকেই সঙ্গে নিয়ে এসেছেন বস্তা-বস্তা আখের ছিবড়া। সঙ্গে নিয়ে আসা চাল-ডাল কোনোরকমে কাঠের আগুনে ফুটিয়ে নেবার জন্য এনেছেন তিনখানা করে ইট। অস্থায়ী উনুন বানাবার জন্য। লক্ষ্য একটাই, আবেগ একটাই, উন্মাদনা একটাই—কতক্ষণে প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে, দেবলোকে পৌঁছে একটা ডুব দিতে পারা যায়। লাখো-লাখো যানবাহনে রাশি রাশি মানুষ। প্রবল ভিড়ে বাহন নিয়ে এগোতে না পেরে ৪–৫ কিলোমিটার দূর থেকে কাচ্চাবাচ্চা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মা-বাবাকে নিয়ে যেভাবে হেঁটে হেঁটে এমনকী খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসেছেন তা অভাবনীয়, অকল্পনীয়। এ দৃশ্য যাঁরা দেখেননি তাঁদের কাছে স্বপ্নের মতো মনে হবে। বিশ্বরূপী হিন্দু সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে একটা ডুব দিয়ে যাঁরা ফিরে গেছেন তাঁদের চোখে-মুখে, সারা দেহ-মনে প্রাপ্তির এবং তৃপ্তির যে ছাপ তাকে স্বর্গীয় সৌন্দর্য বললেও মনে হয় অনেক কম বলা হবে। কী পরম ধন যে সঞ্চয় করে নিয়ে যাচ্ছেন তা যেন কেবল তাঁরাই জানেন। অন্যের অনুভূতিতে তার ব্যাখ্যা হয় না, হতে পারে না। এই হল কুম্ভমেলা। আর ১৪৪ বছর পরে এবারে তো তার সর্বোত্তম যোগ—মহাকুম্ভ।

সাধুসন্ত বিশেষ করে নাগা সন্ন্যাসীদের ছাউনি প্রবেশ এবং অমৃত স্নানযাত্রা অবাক বিস্ময়ে দেখার মতো। আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে শৌর্য-বীর্যের এরকম একাত্ম রূপ কুম্ভমেলা ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। কিন্তু কেবল নাগা সাধুই নয়, মহাকুম্ভের মহারূপে কাকে ছেড়ে কাকে দেখবেন! ছাউনি প্রবেশের সময় কেউ এসেছেন সুসজ্জিত হাতির পিঠে চেপে, কেউ সুসজ্জিত টগবগে ঘোড়ায়, কেউ বা আবার রং-বেরঙের সজ্জাসামগ্রীতে সাজানো নজর কাড়া উঠের পিঠে। কেউ এসেছেন সোনা-রুপো এবং নানা রত্নখচিত সিংহাসনে বসে, কেউ হাওদায়, কেউ-বা আবার সুসজ্জিত পালকিতে। পদাতিক হয়ে যাঁরা এসেছেন তাঁদেরও দেখে মনে হবে যেন কোনো সম্রাটের সেনাবাহিনী।

**সনাতন সংস্কৃতির ভারতবর্ষ সম্পর্কেও গর্ববোধ করেছেন বিদেশ থেকে আসা পুণ্যার্থীরা গেয়েছেন গায়ত্রী মন্ত্র, কেউ গেয়েছেন দুর্গাস্তোত্র, কেউ জয়ধ্বনি করেছেন সনাতনের, কেউ ভারতের।**

কত জনের অঙ্গসজ্জা, চলনে-বলনে কত রকমারি বাহার। জটাজুট ছাড়াও কারো কারও মাথার চূড়া থেকে কোমর পর্যন্ত ঝুলছে রুদ্রাক্ষের মালা। শোভাযাত্রার আদ্যপান্ত সুবর্ণ গৈরিকে জ্বলজ্বল করছে। এরকম একজন সন্ত হলেন মৌনীবাবা। তিনি বিশেষ কোনো আখড়া কিম্বা আশ্রমের নন। নিজের মতো নিজে তপজপ করেন। ফুলের মালার মতো রুদ্রাক্ষের মালায় যেমন নিজেকে সাজিয়েছেন তেমনি তাঁর ছোট্ট তাঁবুকে। রুদ্রাক্ষ নাকি রুদ্রদেব শিব ঠাকুরের চোখের মণি। শিব সাধকরা এজন্যই নাকি রুদ্রাক্ষের দারুণ ভক্ত। এসেছেন মহন্ত গীতানন্দ গিরি। ৫৭ বছর বয়সি এই মহন্তর মাথায় থাকে থাকে সাজানো রুদ্রাক্ষের মালা। ১ লক্ষ ২৫ হাজার রুদ্রাক্ষে সাজানো তাঁর মাথার দিকে তাকালে মনে হবে যেন প্রায় ৩ ফুট উঁচু এক বিশাল মুকুট ধারণ করে রয়েছেন। তাঁর এই মুকুট চূড়ার ওজন প্রায় ৪৫ কিলোগ্রাম। সব সময় এই চূড়া মাথায় করেই তিনি চলাফেরা, জপতপ, সাধনা করে থাকেন। মধ্যপ্রদেশ থেকে আসা যোগী রাধেপুরী মহারাজ একটানা ১৪ বছর ধরে তাঁর ডানহাত উঁচুতে তুলে ধরে সাধনা করে যাচ্ছেন। তাঁর এই কঠোর তপস্যার প্রধান লক্ষ্য হলো ভারতের কল্যাণ। ভারতবর্ষ যাতে ফের বিশ্বগুরু হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে, সমাদৃত হতে পারে সেজন্য এর আগে ১২ বছর ধরে একপায়ে দাঁড়িয়ে সাধনা করেছিলেন। এখন ঊর্ধ্ববাহু হয়ে করছেন। গঙ্গাপুরী মহারাজের উচ্চতা মাত্র ৩ ফুট ৮ ইঞ্চি। কিন্তু হিন্দু সমাজ সম্পর্কে তাঁর লক্ষ্য অনেক উঁচু। সনাতনী হিন্দুরা যাতে বিশ্বের মধ্যে সবচাইতে শক্তিশালী হয় সেজন্য তাঁর গুরুদেবের নির্দেশে একটানা ৩২ বছর স্নান করেননি। বার বার কুম্ভমেলায় এসেও না। হিন্দু জাতি মহাশক্তিশালী হলেই তিনি সবচাইতে বেশি পুণ্যার্জন করবেন এটাই তাঁর মত। নাগাদের জুনা আখড়ার একজন সন্ন্যাসী কানাইয়ালাল কুম্ভকলস। এই অদ্ভুত পরিচয়ের কারণ তিনি বছরের পর বছর প্রতিদিন গঙ্গা, শিপ্রা, নর্মদা ও গোদাবরীর জলে ভরা কলস মাথায় করে ১৮ ঘণ্টা সাধনা করে থাকেন। ৫৮ বছর বয়সী এই নাগা সাধুরও এই কঠিন সাধনার প্রধান লক্ষ্য হিন্দু সমাজ এবং ভারতবর্ষের হিত সাধন। অধ্যাত্ম সাধনার পাশাপাশি হিন্দু সমাজ এবং ভারতবর্ষের জন্য এরকম কত সাধুসন্ত এবং অন্যান্যরা যে কত রকমের কঠোর তপস্যা এবং অন্যান্য কাজ করে চলেছেন কুম্ভমেলায় না এলে তা হয়তো কেউ কোনওদিন জানতেও পারবেন না। কারণ এঁদের এই তপস্যা, ত্যাগ, প্রচারমুখী নয়।

প্রসঙ্গত, বর্তমানে ব্রহ্মলীন দেবরাহা বাবা যাঁকে এক শ্রেণীর উন্নাসিক বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিক 'মাচান বাবা' বলে কটাক্ষ করতেন তিনি সব সময় উঁচু মাচানের ওপরে থাকতেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞান এবং প্রভাব ছিল অপরিমেয়। লক্ষ্য ছিল হিন্দু সমাজের মঙ্গল সাধন, হিন্দু জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা, শক্তিশালী করা। সেই সঙ্গে ধ্বংসপ্রাপ্ত হিন্দু ধর্মস্থানের পুনরুদ্ধার ও পুনর্নির্মাণ। অযোধ্যা শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁর সমর্থন পথনির্দেশের কথা বহুবিদিত। এই মহাকুম্ভে তিনি নেই। কিন্তু হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করার জন্য আরও অনেকেই কাজ করে যাচ্ছেন তাঁদের অনেকেই মহাকুম্ভে এসেছে। এখানে 'যুব চেতনা' নামের একটি আধ্যাত্মিক ও সেবামূলক সংস্থা একটি বেশ বড়োসড়ো সমাবেশের আয়োজন করে। লক্ষ্য হিন্দু জাগরণ। সমাবেশের উদ্বোধন করে স্বামী অভিষেকানন্দ ব্রহ্মচারী প্রায় চ্যালেঞ্জের সুরে বলেছেন, 'সনাতনী শক্তির সঙ্গে টক্কর দেবার মতো কোনো শক্তি নেই।' হিন্দু বিরোধীদের দিকে আঙ্গুল তুলে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে যাঁরা সাধুসন্ত এবং রামভক্তদের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁরা এখন বিপাকে পড়ে সেই পাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য মহাকুম্ভে এসে ডুব দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। এবারের মহাকুম্ভে হিন্দু সমাজের কাছে এসব অনেক বড় প্রাপ্তি মনে করা যেতে পারে। লক্ষ্য করার বিষয় হলো সাধুসন্ত, বিশেষ করে বীর রসাত্মক অধ্যাত্ম

জীবনের জন্য আকর্ষণীয় নাগা সন্ন্যাসীদের আখড়াগুলোতে ক্রমাগত সন্ন্যাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের। দলে দলে সদস্য হতে, দীক্ষা নিতে এগিয়ে আসছেন দেশ-বিদেশের নারীরাও। গত ১৮ জানুয়ারি মহাকুম্ভে পঞ্চদশনামী জুনা আখড়ার তরফে সনাতন হিন্দুত্বের ইতিহাসে একটা অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছে। নতুন প্রজন্মের প্রায় ২০০ জন নারী প্রথাগতভাবে নাগা সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন। তাছাড়া প্রায় প্রতিদিনই শয়ে শয়ে পুরুষ নাগা সন্ন্যাসে দীক্ষা নেবার জন্য রীতিমতো আবেদনপত্র দাখিল করেছেন। মহিলাদের দীক্ষা দান করে আখড়ার সন্ন্যাসিনী সাধ্বী দিব্যা গিরি বলেছেন যে এর আগে একসঙ্গে এতজন নারী কখনও দীক্ষা নেয়নি। দীক্ষা গ্রহণকারী মহিলাদের মধ্যে অনেক উচ্চ শিক্ষিতাও আছেন।

গত ১৪ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তির দিন নাগা সন্ন্যাসীদের প্রথম শাহী স্নানযাত্রার পর থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কেবলমাত্র জনজাতি সমাজের ৮ হাজার ৭১৫ জন যুবক-যুবতী নাগা সন্ন্যাসে দীক্ষা নিয়ে সনাতন হিন্দুত্ব রক্ষার শপথ নিয়েছে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবচাইতে বিস্ময়কর আবিষ্কার হলো আগুন। সনাতন হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতিতে অগ্নির পবিত্রতা এবং তাঁর গুরুত্ব সে কী অপরিসীম তার প্রমাণ মেলে যাগযজ্ঞে। অগ্নিকে সাক্ষী রেখে এবং তাতে আগুন প্রদান করে হিন্দুরা যখন কোনো সংকল্প করে তখন তা কেবলমাত্র একটা আচার অনুষ্ঠান নয়, প্রতিজ্ঞা পূরণের অঙ্গীকারও বটে। মহাকুম্ভে শাহীস্নানের পাশাপাশি শুরু করা হয় অনেক মহাযজ্ঞও। রাজসী স্নানের মতো এইসব মহাযজ্ঞও বিপুল আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। প্রায় ১ হাজারেরও বেশি যাগযজ্ঞের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ মহাযজ্ঞের উল্লেখ না করলে মহাকুম্ভের অতি সংক্ষিপ্ত এই বিবরণেও অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে। বিশেষত এইসব মহাযজ্ঞের উদ্দেশ্য জানাটা খুবই জরুরি। অন্তত বর্তমান পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে।

সমগ্র হিন্দু জাতির কল্যাণ এবং একই সঙ্গে বিশ্ব শান্তি কামনায় ১৩ জানুয়ারি থেকে মহাযজ্ঞ শুরু করেন জগদ্গুরু স্বামী অধোক্ষজানন্দ দেবতীর্থ। এজন্য ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড সহ বিশ্বের ১০৮টি পবিত্র নদীর জল আনানো হয়। মহাশিবরাত্রি পর্যন্ত ৪৫ দিন ধরে এই মহাযজ্ঞ করেন তিনি। ১০০০ বর্গফুট জায়গা নিয়ে তৈরি করান বিশেষ যজ্ঞশালা।' বিশেষ 'আসনি' (আসন) বানানো হয় অরুণাচল প্রদেশ থেকে আনানো শুকনো কলাপাতা দিয়ে। যজ্ঞে আহুতি দেবার জন্য ট্রাক ভর্তি নারকেল আসে অসম থেকে। আর আসে সুপারি। কেরালা থেকে আসে প্রচুর এলাচ, গুজরাট থেকে আসে পলাশ ফুল। যজ্ঞবেদীর কাঠামো তৈরি করা হয় শুকনো কুশ দিয়ে। আর যজ্ঞাগ্নির জন্য ব্যবহার করা হয় গোময়ে তৈরি ঘুঁটে দিয়ে। জগদ্গুরুর কথায় এটাই বৈদিক হিন্দু রীতি। মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ ভারতের জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতীর শিবিরেও। তাঁর এই যজ্ঞের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বশান্তির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের তীর্থস্থলগুলোর পুনরুদ্ধার সংকল্প। কেবল ভারতীয় সন্ন্যাসীরাই নন, বিশ্বশান্তি কামনায় মহাযজ্ঞ করেছেন খ্যাতনামা সন্ন্যাসী পাইলট বাবাও। মহাকুম্ভে ১৮ নম্বর সেক্টরে তাঁর শিবিরে ২৬ এবং ৩০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত মহাযজ্ঞে যোগ দিয়ে আহুতি প্রদান করেন আমেরিকা, রাশিয়া, ইউক্রেন, জাপান ইত্যাদি দেশ থেকে আগত ২০০ জনেরও বেশি বিদেশি সন্ন্যাসী।

শুনতে অবাক লাগলেও পাকিস্তানের জবরদখলে থাকা কাশ্মীরকে মুক্ত করে ফের ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এক মহাযজ্ঞ করছেন চিত্রকূটের তুলসী পীঠাধীশ্বর জগদ্গুরু স্বামী রামভদ্রাচার্য। তিনি শ্রীরামজন্মভূমি মুক্তি আন্দোলনেরও অন্যতম পুরোধা মার্গদর্শক ছিলেন। মহাকুম্ভে ৬ নম্বর সেক্টরে প্রাচীন নাগবাসুকি মন্দিরের কাছে শিবির করেছেন তিনি। গত ১৪ জানুয়ারি থেকে শুরু করা তাঁর মহাযজ্ঞ চলে ১২ ফেব্রুয়ারি মাঘী পূর্ণিমার দিন পর্যন্ত। তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা যিনি পূর্ণ করবেন তাঁর ওপর যাতে কোনও বাধাবিঘ্ন না আসে সেই লক্ষ্যে ৩০০ জন আচার্যকে দিয়ে টানা এক মাস ধরে চলা এই মহাযজ্ঞে নানা সমিধ আহুতি দিয়েছেন। ২৫০ কুণ্ডের এই মহাযজ্ঞে ২৫০ জন পুরোহিত এবং তিনি নিজে নিত্যদিন 'অখণ্ড ভারত'-এর জন্য প্রার্থনা করেছেন। ত্রিবেণী সঙ্গমের খুব কাছে বড়ে হনুমান বা ছোটে হনুমান মন্দিরের থেকে সামান্য দূরে অন্য একটি মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৫ জানুয়ারি থেকে। এই যজ্ঞবেদীর মধ্যস্থ যজ্ঞদণ্ড-র উচ্চতা প্রায় ৯ তলা বাড়ির সমান। অনেক দূর থেকে নজরে পড়া এই মহাযজ্ঞের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ণ মাত্রায় গোহত্যা বন্ধ এবং গোমাতাকে ভারতের রাষ্ট্রমাতার মর্যাদা দান করা। এই মহাযজ্ঞস্থলে যে শিবির করা হয়েছিল সেখানে ৯টি ছোট ছোট তাঁবুতে রাখা হয়েছিল নব দুর্গা অর্থাৎ দেবী দুর্গার ভিন্ন ভিন্ন রূপের ৯টি মূর্তি। এই মহাযজ্ঞে অতি গণপতি, অতি সূর্য, অতি বিষ্ণু, অতি রুদ্র এবং অতি গোমাতা, এই পঞ্চদেবের উদ্দেশে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আহুতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিহতদের অমরআত্মার শান্তি তথা মোক্ষ কামনা করে একটি যজ্ঞ করেছে 'অতি বিষ্ণু মহাযজ্ঞ সেবা সমিতি'। এর বাইরে সার্বিক হিন্দু হিতার্থে ১১১ কুণ্ডের অতি রুদ্র মহাযজ্য করেছেন মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী মহেশানন্দ গিরি। এই মহাযজ্ঞে ২১ থেকে ২৮ জানুয়ারি আহুতি প্রদান ও প্রার্থনা করেছেন ১৫১ জন আচার্য। হিন্দু হিতার্থে ১০৮ কুণ্ডের অন্য একটি মহাযজ্ঞ করেছেন শ্রীরামলোচন বাবা লীলাবতীনাথ। তাতে ১ হাজার ১০০ জন আচার্য আহুতি প্রদান করেন।

সব মিলিয়ে দেখা গেছে এবারের এই মহাকুম্ভ মেলা কেবল এই শতাব্দীর মহা মানবমেলা কিম্বা গৈরিকের বর্ণচ্ছটায় প্লাবিত অধ্যাত্মমেলাই নয়, হিন্দুহিত, শক্তিশালী হিন্দু-ভারত, সনাতন ঐক্য তথা হিন্দু জাগরণেরও মহামেলা। হিন্দুত্বের গর্ব, হিন্দু একাত্মতা, হিন্দুত্ব রক্ষা, হিন্দু মহানতার ধারক ও বাহক, বিশ্বশান্তির বার্তাবাহক ভারতবর্ষের সঙ্গে একাত্ম হবার জন্য মহাকুম্ভে আগমন ঘটেছে বহু বিদেশি পুণ্যার্থীরা ও। মহাকুম্ভে এসেছেন ৭৭টি দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধিও। মহাকুম্ভে এসে তাঁরাও কেবল মন্ত্রমুগ্ধ এবং আবেগাপ্লুতই নয়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের প্রশংসায় পঞ্চমুখও হয়েছেন। সনাতন সংস্কৃতির ভারতবর্ষ সম্পর্কেও গর্ববোধ করেছেন বিদেশ থেকে আসা পুণ্যার্থীরা গেয়েছেন গায়ত্রী মন্ত্র, কেউ গেয়েছেন দুর্গাস্তোত্র, কেউ জয়ধ্বনি করেছেন সনাতনের, কেউ ভারতের। জাপানি যোগমাতা কেইকো আকাওয়া যিনি বেশিরভাগ সময় যোগমুদ্রায় ধ্যানস্থ থাকেন, তিনিও মোদী-যোগীর প্রশংসায় রীতিমতো পঞ্চমুখ। রাশিয়া থেকে আসা জনৈকা ভক্ত তো বলেই গেলেন তিনি মহান হিন্দুত্বের মহান ভারতে এসে নিজেকে ধন্য মনে করছেন। গত ১০ ফেব্রুয়ারি পবিত্র পূর্ণমহাকুম্ভে পুণ্যস্নান কনে ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। কারও কারও বক্তব্য, 'ইন্ডিয়া' আবার সত্যি সত্যিই 'ভারতবর্ষ' হতে চলেছে। এবারের মহাকুম্ভ মেলাকে বলা যেতে পারে সনাতনী পরম্পরার মহাসঙ্গম, হিন্দু আত্মার এবং হিন্দু আস্থার মহাসঙ্গম, হিন্দু একাত্মতার মহাসঙ্গম। □

# তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের দেশ হয়েও বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি হওয়ার পথে ভারত

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক রেটিং সংস্থা এস এন্ড পি (স্ট্যান্ডার্ড এন্ড পুওরস)-এর সমীক্ষায় আগেই ইঙ্গিত ছিল। এবার ক্রমশ প্রতীয়মান হচ্ছে, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার দিকে এগোচ্ছে ভারত। গত বছরের ১৭ অক্টোবর এস এন্ড পি- প্রকাশিত 'উদীয়মান বাজারের দিকে তাকান : একটি সিদ্ধান্তমূলক দশক' শীর্ষক প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছিল, আগামী তিন বছরের মধ্যে ভারত দ্রুততম বর্ধিষ্ণু প্রধান অর্থনীতি এবং ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হতে চলেছে।

২০২৪ সালে জেপি মরগ্যানের সরকারি উদীয়মান বাজার বন্ড সূচকে ভারতীয় সরকারি বন্ডের প্রবেশাধিকার অতিরিক্ত সরকারি তহবিল সরবরাহে সহায়ক হতে পারে এবং দেশীয় পুঁজিবাজারে উল্লেখযোগ্য সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে বলে দাবি করা হয়েছিল। সেইসূত্রে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক রেটিং সংস্থাটি মনে করছে, এটি কেবল প্রথম পদক্ষেপ— এরপর বিনিয়োগকারীরা উন্নত বাজার বন্ড সূচকে প্রবেশাধিকার এবং প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করার পদ্ধতির সন্ধান চালিয়ে যাবেন। মূলত এই বিষয়টির ওপর ভিত্তি করেই দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও দাবি করেছেন যে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে।

কিন্তু ঠিক কী অংকে অর্থনীতিবিদরা এই দাবিকে মান্যতা দিচ্ছেন? এই মুহূর্তে জার্মানি ইউরোপের বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে বিবেচিত হয়। পাশাপাশি এটি বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিও। সুতরাং বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হতে হলে ভারতকে জার্মানির জায়গাটা দখল করতে হবে বা জার্মানিকে স্থানচ্যুত করতে হবে। সমীক্ষায় সেই লক্ষণও কিন্তু সুস্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। ২০২৩ সালে জার্মানির অর্থনীতি ০.৩ শতাংশ এবং ২০২৪ সালে ০.২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। চলতি বছরেও জার্মানির নেতিবাচক বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। জার্মান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অনুমান করেছে যে, এই বছর দেশটির অর্থনীতি ০.৫ শতাংশ কমতে পারে।

অন্যদিকে বর্তমানে ভারত ৪.২৭ ট্রিলিয়ন ডলার নিয়ে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তালিকায় ভারতের ওপরের দিকে আছে আমেরিকা (৩০.৩৪ ট্রিলিয়ন ডলার)। অনুমান করা হচ্ছে যে, জাপানের অর্থনীতি এই বছর ১.১ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে পেতে পারে। যেখানে ভারতের অর্থনীতিতে ৬.৫ শতাংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। এই পরিসংখ্যানের ওপর ভিত্তি করে অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন যে, অচিরেই ভারত জাপান ও জার্মানিকে পেছনে ফেলে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হতে চলেছে।

এস এন্ড পি-র সমীক্ষকদের অনুমান, ২০৩৫ সালের মধ্যে, উদীয়মান বাজারগুলি বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বৃদ্ধির প্রায় ৬৫ শতাংশই অবদান রাখবে। এই বৃদ্ধি মূলত এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের উদীয়মান অর্থনীতির দ্বারা পরিচালিত হবে, যার মধ্যে রয়েছে চীন, ভারত, ভিয়েতনাম এবং ফিলিপাইনস্। এছাড়াও, ২০৩০ সালের মধ্যে, ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে, ইন্দোনেশিয়া এবং ব্রাজিল যথাক্রমে অষ্টম এবং নবম স্থানে থাকবে।

**ভারতের সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ অবশ্যই জনসংখ্যা বৃদ্ধি। অনুমান, ২০৩৫ সালের মধ্যে জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের এক নম্বর দেশ হবে ভারত।**

এদিকে ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড বা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল তথা আইএমএফ-ও মনে করছে, ২০২৯-'৩০ সাল নাগদ ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে। সেই সময়ে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি তথা জিডিপির পরিমাণ হবে ৬.৪৪ ট্রিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে, জার্মানি ৫.৩৬ ট্রিলিয়ন ডলার নিয়ে চতুর্থ স্থানে এবং জাপান ৪.৯৪ ট্রিলিয়ন ডলার নিয়ে পঞ্চম স্থানে থাকবে বলে তাঁদের অনুমান। অর্থনীতিবিদরা এও মনে করেন, জার্মানির অর্থনীতি যেভাবে ক্ষয় হচ্ছে এবং জাপানের অর্থনীতি যেভাবে মন্থর হচ্ছে, তাতে ভারতকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে খুব বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না।

তবে গোলাপেও কাঁটা আছে। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক দেশ হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে চললেও ভারতের নানা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ার সম্ভাবনা। ভারতের সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ অবশ্যই জনসংখ্যা বৃদ্ধি। অনুমান, ২০৩৫ সালের মধ্যে জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের এক নম্বর দেশ হবে ভারত। সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক পরিষেবা দেওয়ার চাপও বাড়বে সরকারের উপর। আবার অর্থনীতির বৃদ্ধির সঙ্গে পরিকাঠামো ও প্রযুক্তিতে বিনিয়োগও বাড়াতে হবে। এই চ্যালেঞ্জগুলির কিন্তু মোকাবিলা করতে হবে ভারতকে। এস অ্যান্ড পি বলছে, দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক বৃদ্ধি নিয়ে ভারত কী কৌশল নিচ্ছে, ভবিষ্যতে তা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। □

# গল্পকথায় ডাক্তারজী

**অঙ্কুরোদ্গম**

বছর চারেক পরের ঘটনা। ১৯০১ সাল, কিং এডওয়ার্ড সপ্তমের রাজ্যারোহণ উপলক্ষ্যে মহাধুমধাম চলছিল। নাগপুরেও তার আঁচ পড়েছে। সেখানকার এমপ্রেস মিলের মালিকরা রাজানুগত্য প্রকাশ করতে মহাসমারোহে নানা অনুষ্ঠানের সঙ্গে বাজি পোড়ানো উৎসবের আয়োজন করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই বাজি পোড়ানো দেখতে ছেলে-মেয়েদের মহাউৎসাহ। কেশবের কয়েকজন বালক বন্ধু তাকে সঙ্গে করে বাজি পোড়ানো দেখতে যাবে বলে ডাকতে এল। তাদের উৎসাহ দেখে কেশবের মুখে হঠাৎ যেন কালবৈশাখী মেঘের আবির্ভাব ঘটলো। তীব্র কণ্ঠে বন্ধুদের বলল— যে বিদেশি রাজা আমাদের পদানত করে রেখেছে তার রাজ্যারোহণের উৎসবে বাজি পোড়ানো দেখতে যাবে, তোমাদের লজ্জা করে না! বন্ধুরা যেন সম্বিৎ ফিরে পেল— চুপ হয়ে গেল তারা। কেশব বলে চলল— দেখ এই যে সীতাবর্ডি দুর্গে রোজ আমরা দেখি ইংরেজদের পতাকা 'ইউনিয়ন জ্যাক' উড়ছে, এটা আমাদের পক্ষে অসম্মানের নয়! ওখানে কি আমাদের ভোঁসলে রাজাদের গৈরিক পতাকা ওড়ার কথা নয়! —একদম ঠিক বলেছ, কেশবের বন্ধুরা সমস্বরে বলে উঠলো। তার মুখ এবার প্রভাতসূর্যের মতো আলোর আভায় যেন ভরে উঠল।

বালক মন কল্পনায় ভরা। তারাও বিশ্বজয়ের ছবি আঁকতে পারে। এই সময়ে কেশব ও তার বালক বন্ধুদের মনের মধ্যে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠাতা ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের জীবনের বিশেষ প্রভাব ছিল। একদিন সবাইকে একটু কাছে ডেকে অপেক্ষাকৃত নীচু স্বরে কেশব বললো— আচ্ছা, কোনো মতে যদি ওই সীতাবর্ডি দুর্গের মাথা থেকে ইংরেজের পতাকা নামিয়ে গৈরিক পতাকা উড়িয়ে দেওয়া যায়, তবে তো আমাদের দুর্গ জয় হয়ে যাবে। আবার আমরা আমাদের রাজ্য অধিকার করবো, তাই না! এবার বালক বন্ধুরা বেশ উষ্ণতা অনুভব করলো এবং বলল,কিন্তু কেশব, সারা দুর্গ সেপাইরা কঠিন ভাবে পাহারা দেয়। ওখানে প্রবেশ তো অসম্ভব। যাবো কী করে! —বিকল্প পথ ভাবতে হবে, কেশব অত্যন্ত বিজ্ঞ নেতৃত্ব সদৃশ গম্ভীরভাবে উত্তর দিল।

পরের দিন দেখা গেল ওয়াঝে গুরুজীর যে ঘরে তারা সবাই পড়াশোনা করতো তার দরজা বন্ধ। ভেতর থেকে কখনো পড়ার, কখনো খুট্ খাট্ কিছু আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল মাত্র। দু-তিন দিন পরে এমন বন্ধ দরজা দেখে গুরুজীর সন্দেহ হলো। ব্যাপার কী। পড়ার জন্য রোজ দরজা বন্ধের কী দরকার। গুরুজী ব্যগ্র হয়ে তাদের ডেকে দরজা খুলতেই তো থ। সারা ঘরে মাটির স্তূপ। প্রায় মানুষ সমান গর্ত খোঁড়া হয়ে গেছে। এক দিকে পড়ে আছে গাঁইতি, কোদাল, বেলচা ইত্যাদি। অন্যদিকে কেশব-সহ বন্ধুরা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে। তারা শঙ্কিত, গুরুজীতো এবার ভয়ংকর বকবেন, বাড়িতে নালিশ করবেন। করারই কথা, ঘরটার মেঝের যে দশা করেছে।

ওয়াঝে গুরুজী এবার গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন— 'ব্যাপার কী?' দেরি না করে কেশব সব সত্যি কথা বলল— তারা সীতাবর্ডি দুর্গের মাথায় বিদেশি প্রভুর চিহ্ন ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে গৈরিক পতাকা ওড়াতে ওখানে পৌঁছবার জন্য সুড়ঙ্গ খুঁড়ছিল। গুরুজী শুনে ঠোঁটের হাসিটুকু লুকিয়ে গাম্ভীর্যের সঙ্গেই কেশবকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন— তোমাদের ভাবনা ঠিক কিন্তু পদ্ধতি উপযুক্ত নয়। এটা অসম্ভব। অযথা শক্তি খরচ নয়, ভবিষ্যতের জন্য এই দেশভক্তির ভাবকে সুরক্ষিত রাখো— দিন আমাদের আসবেই।

আবার গর্তে মাটি ভর্তি করে, যন্ত্রপাতি নিয়ে কেশব ও তার বন্ধুরা চলে গেল। আর ওয়াঝে গুরুজী তখন তাকিয়ে ছিলেন সেদিকে। পুলকিত মনে ভবিষ্যৎ ভারতের আলোকিত পথের রেখা যেন দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি। পরে বড়ো হয়ে কেশব যখন ডাক্তারি পড়তে কলকাতা গেলেন, তখন ওয়াঝে গুরুজী কৌতুকের সঙ্গে এই ঘটনার কথা সবাইকে বলতেন।